নীরব মোদী-বিজয় মালিয়া-
ললিত মোদী আমার অলঙ্কার

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ত্রিপুরার বিলোনিয়ায়
লেনিনের মূর্তি ভাঙ্গছে
উন্মত্ত গেরুয়া বাহিনী

ফেব্রুয়ারি'১৮ ■ ৪৬তম বর্ষ ■ দশম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের দাবিতে

সাংবিধানিক প্রধানদের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,
রাষ্ট্রপতি ভবন
নয়াদিল্লী,

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আমরা জানাচ্ছি যে, আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরিত আমাদের পূর্ববর্তী পত্রের (স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৮০/১৬, তাং-২২/১২/১৬) প্রাপ্তি স্বীকার আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছে (ক্রমিক নং পি-২ / ডি/১১০১১৭০১৬৪, তাং-১১/০১/২০১৭)। কিন্তু পত্রে উল্লিখিত বিষয়সমূহ, যথা, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার বিষয়গুলি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে বাকি সমস্ত রাজ্য তাদের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করলেও, শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে বারংবার আর্থিক সঙ্কটের কথা বলে বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক সহ, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হচ্ছে।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ০১.০১.২০১৮ থেকে সংশোধিত বেতনক্রমের ওপর পুনরায় ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে, ফলে এ রাজ্যের কর্মচারীদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার ফারাক আরও বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর ২০১৭-য় জারি করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরও এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বভাবতই বেতন সংশোধনের ন্যায়সঙ্গত দাবিটিকে এর মধ্য দিয়ে অবহেলা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে আপনার কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন, পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষোভ নিরসনে রাজ্য সরকার যাতে প্রয়োজনীয় সদর্থক ভূমিকা পালন করে, সেই বিষয়ে আপনি প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করুন।

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
সাউথ ব্লক,
নয়াদিল্লী,

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আমরা জানাচ্ছি যে, আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরিত আমাদের পূর্ববর্তী পত্রের (স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৮১/১৬, তাং-২২/১২/১৬) প্রাপ্তি স্বীকার আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছে (ক্রমিক নং পিএমওপিজি/ডি/২০১৭/০০০৭০৩০, তাং ৫/২/১৭)। কিন্তু পত্রে উল্লিখিত বিষয়সমূহ, যথা—রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার বিষয়গুলি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে বাকি সমস্ত রাজ্য তাদের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করলেও, শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে বারংবার আর্থিক সঙ্কটের কথা বলে বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক সহ, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বলই হবেই।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ০১.০১.২০১৮ থেকে সংশোধিত বেতনক্রমের ওপর পুনরায় ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে, ফলে এ রাজ্যের কর্মচারীদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার ফারাক আরও বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর ২০১৭-য় জারি করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরও এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বভাবতই বেতন সংশোধনের ন্যায়সঙ্গত দাবিটিকে এর মধ্য দিয়ে অবহেলা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন, পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষোভ নিরসনে রাজ্য সরকার যাতে প্রয়োজনীয় সদর্থক ভূমিকা পালন করে, সেই বিষয়ে আপনি প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করুন।

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে প্রদত্ত চিঠিগুলি ভাষান্তর করে প্রকাশ করা হলো

রাজ্যপালকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

মাননীয় রাজ্যপাল,
রাজভবন
কলকাতা,

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আমরা জানাচ্ছি যে, আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরিত আমাদের পূর্ববর্তী পত্রের (স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৭৯/১৬, তাং-২২/১২/১৬) প্রাপ্তি স্বীকার আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছে (ক্রমিক নং ১৬২-এস পি তাং ২৪.০১.২০১৭)। কিন্তু পত্রে উল্লিখিত বিষয়সমূহ, যথা—রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার বিষয়গুলি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে বাকি সমস্ত রাজ্য তাদের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করলেও, শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে বারংবার আর্থিক সঙ্কটের কথা বলে বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক সহ, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হচ্ছে।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ০১.০১.২০১৮ থেকে সংশোধিত বেতনক্রমের ওপর পুনরায় ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে, ফলে এ রাজ্যের কর্মচারীদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার ফারাক আরও বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর ২০১৭-য় জারি করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরও এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বভাবতই বেতন সংশোধনের ন্যায়সঙ্গত দাবিটিকে এর মধ্য দিয়ে অবহেলা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে আপনার কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন, পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষোভ নিরসনে রাজ্য সরকার যাতে প্রয়োজনীয় সদর্থক ভূমিকা পালন করে, সেই বিষয়ে আপনি প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করুন। সবশেষে, আমাদের বিনম্র আবেদন, উপরোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনি আপনার সুবিধা মতো দিন ও সময়ে সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে দিন।

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/১৬/১৮ তারিখ ঃ ০৮/০৩/২০১৮

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু সম্পর্কে।

মহাশয়া,

আপনি হয়তো জেনেছেন, গত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য তাঁদের সংশোধিত বেতন ও পেনশন কাঠামোর উপর আরও ২ (দুই) শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ মঞ্জুর করেছেন। এর ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারী / পেনশনারদের বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে অসংশোধিত বেতনের উপর ৪৯ শতাংশ।

আপনি জানেন, বেশ কিছুকাল ধরেই রাজ্য সরকারী কর্মচারী / পেনশনারদের বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ বকেয়া পড়ে থাকায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও পেনশনাররা এই দুর্মূল্যের বাজারে নিদারুণ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

সম্প্রতি আমরা বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফের দ্রুত মীমাংসা ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও শীঘ্র কার্যকরী করার দাবিতে আপনার হস্তক্ষেপ চেয়ে বেশ কয়েকটি স্মারকলিপি দিয়েছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে অমীমাংসিত দাবিগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনার জন্য অনুরোধও জানিয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি।

তাই বর্তমানে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও রূপায়ণের জন্য আমরা পুনরায় আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি, একই সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারী / পেনশনারদের অমীমাংসিত দাবিগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা আপনার সঙ্গে আলোনায় বসায় জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশা করি, এ ব্যাপারে আপনি সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

বামপন্থার অবিনশ্বরতা

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। তিন দিক থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে ঘেরা এই রাজ্যটির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের ফল, সারা দেশের মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কার্যত ঝড় তুলেছে। নির্বাচন বা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক চাপান-উতোরের সময় বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত যাঁদের কণ্ঠ ও কলম সক্রিয় হয়ে ওঠে, ত্রিপুরার নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ে তাঁরা কাটা-ছেঁড়া করতে শুরু করেছেন। নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সোৎসাহে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা ফলাফলকে উল্টে-পাল্টে দেখা বা পরামর্শ দেওয়া কি কোন অস্বাভাবিক বিষয়? এর উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দুটোই হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে যারা 'না' বলবেন, তাঁরা বলতেই পারেন, অস্বাভাবিক বিষয় কেন হবে? লোকসভা অথবা যে কোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তো এমন আলোচনা হয়েই থাকে। সুতরাং ত্রিপুরাকে নিয়েই বা হবে না কেন? কিন্তু যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা হলো কই আগে তো দেখিনি। ত্রিপুরা নামক র‍্যাজটি কি ভারতের মানচিত্রে তেসরা মার্চের আগে ছিল না? নাকি এবারই প্রথম ঐ রাজ্যে নির্বাচন হল? এতদিন ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা, বিধানসভা ও লোকসভার আসন সংখ্যা প্রভৃতি সবকিছুর নিরিখেই এই রাজ্যটিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করা হতো। বা বলা ভালো, মনে করানো হতো। তাই একটানা ২৫ বছর লোকসভা, বিধানসভা এবং বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসিত সংস্থার নির্বাচনে উপর্যুপরি বামপন্থীরা বিপুল ব্যবধানে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে পরাজিত করলেও, তা কখনও কোন সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের শিরোনাম হয়নি। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীকেও এত ব্যগ্র হতে দেখা যায়নি।

ত্রিপুরার মতো একটি রাজ্যে, যেখানে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, বড় শিল্প গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা নেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে পরিকাঠামোগত যোগাযোগ খুবই দুর্বল, মোট জমির মাত্র ২৭ শতাংশ কৃষিজমি এবং কৃষি বলতে মূলত রবার চাষ—সেখানে বাঙালী উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত অংশের গরিব মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প (রেগা সহ) এবং রাজ্য সরকারের নিজস্ব কিছু প্রকল্প রূপায়ণে দীর্ঘ সময় ধরে যে স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার পরিচয় রাখা হয়েছে, তা কখনও বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমগুলিতে আলোচনার বিষয় হয়নি। নিরক্ষরতা দূরীকরণে পূর্ববর্তী সরকারের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল—যার ফলে ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার বাড়তে বাড়তে দেশের এক নম্বর রাজ্য কেরালাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, না, তা নিয়েও তেমন কোনো আলোচনা কখনও চোখে পড়েনি। সর্বোপরি, এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত ও হামলাকে মোকাবিলা করে উপজাতি-অনুপজাতি ঐক্যকে রক্ষা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতে টেনে আনার জন্য, তাদের স্বশাসনের অধিকার প্রদান এবং অটোনোমাস এরিয়া কাউন্সিল গঠনের মতো সাফল্যগুলির ওপরেও মিডিয়ার প্রচারের আলো পড়েনি।

অথচ ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এই কাজটা খুব সহজ কাজ ছিল না। মিশ্র সংস্কৃতির এই রাজ্যটি ঔপনিবেশিক আমলে ছিল করদ রাজ্য। স্বাধীনতার সময় এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ঔপনিবেশিক আমলে উপজাতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার ভৌগোলিক এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ঐ সময় থেকেই প্রতিবেশী বাংলা (অবিভক্ত) থেকে অনুপজাতি জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, যারা ত্রিপুরার নিবিড় বনাঞ্চলকে সাফ করে জনবসতি গড়ে তুলতে থাকে। বনাঞ্চলের সম্পদকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে (সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতে) অনুপ্রবেশকারী অংশ আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে কৃষি মজুর হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। উপজাতি-অনুপজাতি সামাজিক বিরোধের সূত্রপাত এখান থেকেই।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ত্রিপুরা রেলপথসহ সমস্ত পরিকাঠামোগত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই অবিভক্ত বাংলার উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশভাগের পর এই সংযোগ ছিন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরা কার্যত সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত সমস্যা হিসেবে যুক্ত হয় অনুপ্রবেশের সমস্যা। এই দুই সমস্যা একত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতির ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করে। সমস্যা জর্জরিত এই রাজ্যটিকে আরও একবার ধাক্কা সামলাতে হয়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময়ে। বহু মানুষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমানা পেরিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। ফলস্বরূপ ত্রিপুরার জনবৈচিত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং এক সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কৃষি, কুটির শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অনুপজাতি অংশের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভকে ব্যবহার করে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। যার সশস্ত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭৮ সালে, বিজয় রাংখালের নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্সের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে গঠিত হয় বিশ্বমোহন দেববর্মার নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা। পৃথক 'তুইপ্রাল্যান্ডের' দাবি তোলা আই পি এফ টি, যাদের জোটসঙ্গী করে বিজেপি নির্বাচনী বৈতরণী পার হলো, তারা এন এল এফ টি-রই পরিবর্তিত রূপ।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও জনবিচ্ছিন্ন করা এবং উপজাতি-অনুপজাতি ঐক্য প্রতিষ্ঠা, শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীকে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে টেনে আনার প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকার ও বামপন্থী শক্তির যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা, না, তা নিয়ে কখনও চায়ের কাপে ঝড় তুলতে দেখা যায় নি মিডিয়া বা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু বামফ্রন্ট পরাজিত হতেই এরা শীতঘুম ভেঙে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছেন। এদের উল্লাসের কারণ বামপন্থীরা নাকি লুপ্তপ্রায় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ঠিক একইরকম উল্লাস আমরা দেখেছিলাম ২০১১ সালে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট পরাজিত হওয়ার পর। কিন্তু এবারে তাদের উল্লাসের ঢেউ আরও স্ফীত হওয়ার আগেই, জোর ধাক্কা এসে লাগল সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে। যেখানে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে ১৮০ কিমি দীর্ঘপথে লং মার্চ করলের প্রায় চল্লিশ হাজার দরিদ্র, ছিন্নবস্ত্র কৃষক। শুধু তাঁদের কাঁধের লালঝাণ্ডা মহরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের আকাশের রংকে লাল করে তুলল, তা-ই নয়, শহরের রাজপথগুলিও লাল হয়ে উঠল সমাজের অন্নদাতা অথচ নিজেরা আধপেট খেয়ে থাকা কৃষকদের ফুটিফাটা পা থেকে ঝড়ে পড়া রক্তে। শিল্প ও চলচ্চিত্র রাজধানী মুম্বাই কখনও এ দৃশ্য দেখেনি। আচ্ছা, লালঝাণ্ডা কাঁধে কৃষকদের যে হার না মানা লড়াই সরকারকে বাধ্য করল দাবি মানতে, তা বামপন্থা নয়? এর আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কৃষকরা লালঝাণ্ডা কাঁধে যে লড়াই করেছেন তা বামপন্থা নয়? গত ছাব্বিশ-সাতাশ বছরে সমস্ত পেশার শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে যে ১৭টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট হয়েছে, সেই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের একটা বড় অংশের কাঁধেই ছিল লালঝাণ্ডা। তা বামপন্থা নয়? ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, ঐ ক্ষেত্রের কর্মচারীদের যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই, সেখানেও গিজ গিজ করে লালঝাণ্ডা। এটা বামপন্থা নয়? কয়লা শিল্পের বেসরকারী করণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই, তা বামপন্থা নয়? এ রাজ্যে মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের মতো জরুরী দাবিগুলিকে নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে রাজ্য কর্মচারীরা যে প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন, তা বামপন্থা নয়?

নির্বাচনে জয়-পরাজয় নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরার বামপন্থী শক্তি নিশ্চয়ই তাঁদের পরাজয়ের কারণ খুঁজবেন। কোনো ভুল হয়ে থাকলে সংশোধন করবেন। কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়-পরাজয় দিয়ে বামপন্থার কার্যকারিতা বিচার করা যায় না। সমাজে অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা যতদিন থাকবে, তার বিরুদ্ধে মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যারিকেডে লালঝাণ্ডা ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত থাকবেই। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বামপন্থাকে অপ্রসাঙ্গিক প্রমাণ করতে তৎপর পণ্ডিতবর্গের কাছেও এই ইতিহাস অজানা নয়। জানেন বলেই লালঝাণ্ডার প্রতি মেহনতী মানুষের যে সহজাত আকর্ষণ, তাকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই এই প্রচার। কিন্তু নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, রিক্ত-নিঃস্ব গরিব মানুষ জানেন তাঁদের কাঁধে লাল ঝাণ্ডা ছাড়া আর কোন রঙের ঝাণ্ডা যে ভরসা যোগায় না। □

১৬ মার্চ, ২০১৮

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক নির্বাচন

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বিধানসভার নির্বাচনের ভোট গণনা, বিগত ৩ মার্চ, ২০১৮ সম্পন্ন হয়। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় একটানা ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান চেয়ে বিজেপি জোটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫০.৫ শতাংশ মানুষ, অপরদিকে রাজ্যের প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ বামপন্থীদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। ভোটগণনার শেষে দেখা যায় নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ৩৫টি আসন, জোটসঙ্গী পৃথক রাজ্যের দাবিদার আইপিএফটি ৮টি আসন অপরদিকে বামপন্থীরা পেয়েছে ১৬টি আসন। ত্রিপুরার এই ফলাফল কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও মনে রাখা প্রয়োজন ত্রিপুরা থেকে বাম সরকারকে হঠানোর জন্য বিজেপি এবং তাদের চালিকা শক্তি সংগঠন আর এস এস নির্বাচনের বহু পুর্ব থেকেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। একদিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা অপরদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আই পি এফ টি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ যেমন হয়েছে তেমনি কেন্দ্রের সরকারের পক্ষ থেকে কার্যত অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরি করা হয়েছে। যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ গঠন করে বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেগা, গরিব মানুষের ঘর প্রভৃতি প্রকল্পে ত্রিপুরাকে ন্যায্য পাওনা দেয়নি বলে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বারে বারে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য থেকে বাম সরকারকে উৎখাত করাকেই পাখির চোখ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ তো করা হয়নি, উপরন্তু খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার জনগণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির স্বপ্ন দেখানো হয়েছে যার প্রকৃত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন এখনই উঁকি দিচ্ছে কারণ, ২০১৪ সালে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান দেশের সরকারের প্রধান শাসক দল বা তার প্রধানমন্ত্রী কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। সবেলাপরিবিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রচার এবং নির্বাচনের আগে গরিব মানুষের কাছে ভেটও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা পাওয়া মানিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গেরুয়া বাহিনী এতটাই উদ্গ্রীব ছিল যে ফলাফলের আভাস পাওয়া মাত্রই মানিক সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ধনপুর বিধানসভা আসনে তাকে পরাজিত ঘোসণা করে তার বিরুদ্ধ প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, গণনাকেন্দ্রের মধ্যেই বিজেপি জোটের পক্ষ থেকে। যদিও পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে গণনা সম্পূর্ণ হয় এবং দেখা যায় মানিক সরকার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৫৫৪১ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পর বামপন্থী দলগুলির কার্যালয়সহ ট্রেড ইউনিয়ন অফিস এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষজনের বাড়িতে আক্রমণ এবং ভাঙচুর শুরু হয়, যা আমাদের রাজ্যে ২০১১ সালের পরিবর্তনকে মনে করিয়ে দেয়। ৩ মার্চ ফল প্রকাশের পর ৪ মার্চ বিলোনিয়া শহরে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় লেনিনের মূর্তি, পরবর্তীতে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে ভাঙা হয় লেনিন মূর্তি। গোটা রাজ্য জুড়ে যখন গণতন্ত্রের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলছে তখন তা থেকে বাদ যায়নি হাসপাতাল এবং হাসপাতালের কর্মীরাও। ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মী অরুণ দেকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মাথা ও কোমরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। রাজ্য জুড়ে আক্রান্ত হয়েছে বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনের দপ্তরগুলিও, যার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের ঘটে যাওয়া আক্রমণগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনের কর্মী নেতৃত্ব হিসাবে আমরা জানি দেশের শাসকশ্রেণী চিরকালই ভয় পায় লাল ঝাণ্ডাকে, লাল ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে থাকা বামপন্থীদের, দেশের শ্রমজীবীদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের পাশে থাকা বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গণসংগঠনগুলিকে। নিজেদের প্রতিদিনকার পথ চলার অভিজ্ঞতা থেকে এটাও আমরা জানি শাসকশ্রেণীর এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে মতাদর্শে বলীয়ান হয়ে শাসকের চোখে চোখ রেখে অকুতোভয় সাহসে লাল পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে চলাই একমাত্র পথ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের আপামর কর্মচারী সমাজ এই লড়াইতে শামিল হয়েছে। ত্রিপুরার আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত করেছে। আমরা নিশ্চিত ত্রিপুরার আক্রান্ত কর্মচারী সমাজও সমাজের অপরাপর অংশের আক্রান্ত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই আক্রমণকে প্রতিহত করেই লাল ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে যাগে আগামীর পথে। কারণ ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষ জানেন গণশত্রুদের মোকাবিলা কিভাবে করতে হয়। গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ ভাগে এমনই লড়াইয়ে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। এবারেও হবেন। □

দেবাশীষ রায়

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

গত ১০ মার্চ ২০১৮, শনিবার, সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে ৪র্থ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টায় সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য। শোকপ্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালনের পর, সভায় প্রাথমিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একেবারে ব্লক স্তর পর্যন্ত যে সাংগঠনিক সফরের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি পর্যালোচনামূলক আলোচনা করেন। এই সফরের সাধারণ অভিজ্ঞতা হলো রাজ্যের অধিকাংশ ব্লকেই সংগঠনের কর্মীরা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করছেন। এর মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মনে সংগঠন সম্পর্কে আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে যে যে ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও দুর্বলতা রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণের কথাও তিনি বলেন। এই সময়কালেই অন্তর্ভুক্ত ১৭টি সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনগুলি সম্পর্কেও একটি মূল্যায়ণ তিনি হাজির করেন। ব্লক সফরের পর কলকাতার সেক্টরগুলির সাথে সভা চলছে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে যৌথ বৈঠক করা হবে। এই সমস্ত সাংগঠনিক উদ্যোগের লক্ষ্যগুলি হলো—১। সদস্য সংগ্রহ, পত্রপত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, ২। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুত করা। তিনি আরও বলেন, আগামী ২৪-২৫ মার্চ রাজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ওপর উপস্থিত ২৯টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও একটি সহযোগী সমিতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকেই সদস্য সংগ্রহ, পত্র-পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহসহ প্রতিটি সাংগঠনিক কাজ সময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন। সমগ্র আলোচনাগুলিকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি ঘোষণা করেন যে আগামী ৫-৮ এপ্রিল তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাই শহরে সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। তিনি সংগঠন সংক্রান্ত গৃহীত দলিলটিকেও আলোচনায় গুরুত্ব দেবার কথা বলেন। □

স্টিফেন হকিং

এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার চিরবিদায়

পদার্থবিদ্যায় নক্ষত্র পতন হলো। চলে গেলেন স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে নিজের বাড়িতে ২৪ মার্চ ২০১৮ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সাম্প্রতিক সময়ের পদার্থবিদ্যার জ্যোতিষ্ক স্টিফেন হকিং। অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর সন্ধান দিয়ে গেলেন স্টিফেন হকিং। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে স্টিফেন হকিং যেভাবে সৃষ্টিরহস্য গবেষণা করে গেছেন তা বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করেছে।

স্টিফেন হকিং রেখে গেলেন তিন সন্তান লুসি, রবার্ট এবং টিম-কে। ঐদিন সকালে হকিংয়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে কন্যা লুসি জানিয়েছেন, বাবার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন অসাধারণ মানুষও ছিলেন।'

ঘটনাচক্রে হকিংয়ের জন্ম আর মৃত্যু দিন দুটি জুড়ে গেল বিজ্ঞানের ইতিহাসে দুই কিংবদন্তী বিজ্ঞানীর জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে। হকিং জন্মেছিলেন ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি। ওই দিনটি গ্যালিলিও গ্যালিলি'র মৃত্যুদিন। আবার তাঁর মৃত্যুর দিনে (১৪ মার্চ) দিনে জন্মেছিলেন আপেক্ষিকতাবাদের জনক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। গ্যালিলিও বিশ্বকে দিয়েছিলেন মহাবিশ্বের তত্ত্ব। আর সেই তত্ত্বকে আইনস্টাইন যুক্তিনির্ভর করেছিলেন। জটিল অঙ্ক দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন মহাবিশ্বের ধারণাকে। আর সেই বিজ্ঞান ভাবনাকে আরও কয়েক যোজন এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্টিফেন হকিং। ভাবাশ্রয়ী চিন্তা থেকে ক্রমশ বিজ্ঞানকে যুক্তির দিকে নিয়ে আসতে হকিংয়ের অবদান তাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শারীরিক অক্ষমতার মাঝেও কয়েকজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে স্টিফেন হকিং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন যা গোটা মানব ইতিহাসের কাছেই গৌরবের। সামান্য গবেষণাগারে বিজ্ঞান চর্চা করেও কী করে সুদূর ছায়াপথের গোপন রহস্যের সমাধান করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন হকিং।

১৯৬৩ সালে হকিং যখন মাত্র ২১ বছরে পড়েছেন, তখনই তিনি জটিল মোটর স্নায়বীয় রোগে আক্রান্ত হন। হকিংয়ের রোগের নাম অ্যামিয়োট্রপিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস। সংক্ষেপে এ এল এস। ডান হাতের চারটি আঙুল বাদে হকিংয়ের গোটা শরীরটা ছিল অকেজো। সেই সময় ব্রিটেনের তাবড় তাবড় চিকিৎসকরা হকিংকে দেখে বলেছিলেন তিনি দুই বছরের বেশি বাঁচবেন না। কিন্তু জটিল রোগের সঙ্গে মোকাবিলাতেই তিনি অনন্য হয়ে থেকেছেন। হকিংয়ের ক্ষেত্রে যেন রোগটি খুব ধীরগতিতে এগিয়েছিল। রোগ ধরা পড়ার পরেও তিনি ৫৫ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। ভবিতব্যকে মানতেন না হকিং। তাই তিনি প্রযুক্তির আশ্রয় করেই ওই অবস্থাতেই ৭৬ বছর পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে লড়ে গেলেন। জীবদ্দশায় কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন হকিং। আইনস্টাইনের পর কোনও বিজ্ঞানী এমন করে বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয়তা পাননি।

জীবনকালেই তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে হলিউডের সিনেমা। ২০০৪ সালে তৈরি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বেনেডিক্ট কামবারব্যাচ। এই ছবিটি স্টিফেন হকিংয়ের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময়কালের কথা। হকিংয়ের ১৯৬০-১৯৮০ সালের জীবনকথা নিয়ে তৈরি হয়েছে বায়োপিক 'দ্য থিওরি অব এভরিথিং'। এখানে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেছেন এডি রেডমেন। এই ছবিতে হকিং-এর স্পিচ সিন্থেসাইজার ভয়েস আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করে দর্শকদের চমক দিয়েছিলেন পরিচালক। হকিংকে প্রায়শই টেলিভিশনের টকশো-তে দেখা যেত। হকিং ১৯৬৫ সালে জেন ওয়াইল্ড-কে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের তিন সন্তান। ২৫ বছর পর ওয়াইল্ডের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় হকিংয়ের। এরপর তিনি তাঁর সবসময়ের দেখাশোনা করতে থাকা নার্স এলাইন ম্যাসনকে বিয়ে করেন। যদিও এ সম্পর্কও বেশি দিন টেকেনি।

তবে যতই সিনেমা হোক কিংবা কমিক্স, যে বইটি হকিংকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলেছিল তা অবশ্যই 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম ঃ ফ্রম বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল'। একথা হকিংও মানতেন। দশম শ্রেণীর সামান্য অঙ্ক জানা যে কোন ছাত্র-ছাত্রীই এই বই পড়ে আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে সহজেই জানতে পারবে। মহাকাশ পদার্থবিদ্যা যতটা গণিত নির্ভর, ততটাই সাধারণ মানুষের কাছে আগ্রহের। কিন্তু হকিংয়ের মতো কোন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

স্বর্গ বলে সম্ভবত কিছু নেই। মৃত্যুর পরে জীবন বলেও কিছু হয় না। এই অসাধারণ ব্রহ্মাণ্ড উপভোগ করার জন্য আমাদের একটাই জীবন।—স্টিফেন হকিং

নিজের ধ্যান ধারণাকে ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেননি। এক্ষেত্রে সর্বকালের সেরা শিরোপা অনায়াসেই হকিং পেতে পারেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হকিংয়ের 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' শুধু ইংরেজিতেই বিক্রি হয়েছে কোটির উপর। টানা পাঁচ বছরে বেশি সময় ধরে লন্ডন সানডে টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় থেকেছে বইটি। বাংলাসহ ১৪টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে। ২০০১ সালের মধ্যে ৩৫টি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'। ২০০১ সালে আবার প্রকাশ পায় হকিংয়ের পরবর্তী বই 'দ্য ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল'।

শুধু বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বের বাইরে মানুষ হিসেবে স্টিফেন হকিংকে নানা সময় সাড়া দিতে দেখা গেছিল। রাজনীতি নিয়েও সরব হতে দেখা গেছিল ওই বিজ্ঞানীকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বুদ্ধিমত্তা' নিয়ে তিনি প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। সরব হয়েছিলেন ব্রেক্সিটের বিরুদ্ধেও। হকিং আপাদমস্তক বস্তুবাদী ছিলেন। 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্বকে কোনও দিনই তিনি মানেননি। ঘোষিত নাস্তিক ছিলেন।

হকিংয়ের গবেষণার বেশিরভাগটাই জুড়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর মহাবিশ্ব। বহির্জগতের বিপুলাকার বস্তু থেকে ক্ষুদ্র কণা ও তাদের চরিত্র নিয়ে তিনি সারা জীবন গবেষণা করে গেছেন। এর মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছিল কৃষ্ণগহ্বর, পরিভাষায় ব্ল্যাক হোল। ১৯৭৪ সালে কৃষ্ণগহ্বরের ওপর তাঁর বিখ্যাত থিওরি 'হকিং রেডিয়েশন' গোটা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই খোঁজ তাঁকে মাত্র ৩২ বছর বয়সে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো করে দেয়। ১৯৭৯ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের লুকেসিয়ান প্রফেসর হন। এই পদে ছিলেন আইজ্যাক নিউটনও।

একটি যন্ত্রচালিত হুইলচেয়ার ছিল হকিংয়ের একমাত্র অবলম্বন। ডান দিকে নিজের ঘাড়কে সবসময় হেলিয়ে রাখতে হতো। ওই হুইলচেয়ার হাতলের কন্ট্রোলে তাঁর সবসময় হাত থাকতো। পক্ষাঘাতের জন্য কথা বলতে হতো কম্পিউটার স্পিচ সিন্থেসাইজারের মাধ্যমে। গোটা বিশ্ব তাঁকে এই অবস্থাতেই দেখতে বেশি অভ্যস্ত। বছরের পর বছর তিনি ওই অবস্থায় শুধু বেঁচে থাকা নয়, অত্যাধুনিক গবেষণা চালিয়ে এসেছেন।

জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে কী করে একজন মানুষ জীবনের আস্বাদ নিতে পারেন তা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে গেছেন স্টিফেন হকিং। হকিং দেখিয়েছিলেন হুইল চেয়ারে বসেও মস্তিষ্ক শক্তি বলে কী ভাবে মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়ানো যায়। মানসিক জোর যে ঠিক কতটা ছিল, তার প্রমাণ মেলে এ এল এস নিয়ে হকিংয়ের করা এক মন্তব্যে। বিখ্যাত ওই বিজ্ঞানীকে তাঁর অসুখ নিয়ে বারংবার প্রশ্ন করা হতো। একবার ওইরকম প্রশ্নের একটি উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'আমার এইরকম কোনও রোগ আছে তা অনুভবই করি না। চেষ্টা করি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবন কাটাতে। আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, এমন কোনও কিছুই আমি পাত্তা দিই না।'

জটিল গাণিতিক সমীকরণকে সম্বল করে কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন স্টিফেন হকিং। বন্ধু রোজার পেনরোজকে নিয়ে হকিং আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। মহাবিশ্বের উৎপত্তি যে মহাপ্রলয় বা বিগ ব্যাংয়ের ফলে ঘটেছে তা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওই দুই বিজ্ঞানী। ১৯৯৭ সালে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে একটি বাজি ধরেছিলেন হকিং। তিনি জানিয়েছিলেন—কৃষ্ণগহ্বর বলে মহাবিশ্বে কিছু হয় না। পরবর্তী সময়ে সেই তথ্যকে সংশোধন করেতে হয়। তিনিই পরে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব যে রয়েছে সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। হকিং যুগের আগে মানুষের ধারণা ছিল, মহাকর্ষের ভিতর মহাকর্ষীয় বল এতটাই বেশি যে এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করতে পারে। অসীম শক্তির ওই বলের নাগাল থেকে কিছুই পালাতে পারে না। এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণও নয়। হকিং প্রথম কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মহাবিশ্বে এমন বস্তুও রয়েছে যা কৃষ্ণ গহ্বরের মহাকর্ষীয় বল অতিক্রম করতে পারে। নিজের আবিষ্কার 'হকিং রেডিয়েশন' দিয়ে বিজ্ঞানী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণগহ্বরকে ধ্বংস করা সম্ভব। কোনও শক্তিশালী বিকিরণ কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলে তা শক্তি হারায়। ধীরে ধীরে তার ভর কমতে কমতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

ইদানীং কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে কী রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন হকিং। কৃষ্ণগহ্বরে কোনও কিছু প্রবেশ করলে তার পরিণতি কী হয় সে বিষয়ে তিনি অনেকদূর গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণা আগামী দিনে মহাবিশ্বের অনেক অজানাকে আমাদের হাতে নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে 'টাইম টেবল' করা যায়, তা নিয়েও হকিংয়ের জটিল গবেষণা রয়েছে। কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার জন্যই হকিংয়ের খ্যাতি বিশ্বজোড়া হলেও তিনি একবারের জন্য নোবেলের জন্য কখনও মনোনীত হননি।

২০০৭ সালে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ বা জিরো গ্রাভিটি ফ্লাইটে শামিল হয়েছিলেন হকিং। তিনি বিশ্বাস করতেন—এ পৃথিবী একদিন মানুষের বসবাসের উপযোগী থাকবে না। তাই জিরো গ্রাভিটিতে বসবাসের জন্য মানুষকে তৈরি হতে হবে। অন্য কোনও দুনিয়ায় মানুষকে একদিন চলে যেতেই হবে। হকিং জীবনের শেষদিকে বারংবার বহির্জগতের প্রাণ নিয়ে কথা বলে এসেছেন। নানা সময়ে কথা বলেছেন মানুষের থেকে উন্নত ভিনগ্রহের প্রাণী নিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞান এখনো বহির্জগতের প্রাণের সন্ধান পায়নি। কিন্তু হকিং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা বিশ্বাস করে এসেছেন। □

একুশে ফেব্রুয়ারি

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা

অশোক রায়

একুশ শতকের রাজপথেও 'অমর একুশে' মানে যৌবনের স্পর্ধা, একুশে মানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে খোলা চ্যালেঞ্জ, একুশে মানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রসনের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ, একুশে মানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ। তাই মানুষের সভ্যতার বনিয়াদ, ভাষা নিয়ে আবেগে এতটুকু খামতি নেই। বরং বলা ভালো প্রতি বছরের মতো এবারেও একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের সামনে নতুন আশা আর শপথের বার্তা নিয়ে হাজির।

বিশ্বায়ন প্রযোজিত ভাবধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়া নব্য মধ্য বিত্তের একাংশের ইংরেজী ভাষার প্রতি অত্যাধিক প্রীতি ও মাতৃভাষা সম্পর্কে অবজ্ঞার পাশে আন্তর্জাতিক ভাষা শহীদ স্মারক এখনও বিমূর্ত আত্মাভিমান। বাংলা ভাষার এই অনন্য সম্মানে যারা গর্ববোধ করতে অপারগ তারা করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। আবার উল্টোদিকে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে হয়তো মনের গভীরে কোন কষ্ট অনুভব হয় না এমন নয়, তবে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা বাড়ছে ভয়ঙ্করভাবে, আর এই জায়গাটাতেই আমরা আমাদের দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করবো এই নিবন্ধে।

আসলে মাতৃভাষা বা নিজের ভাষা হলো মৌলিক অধিকার। আমার কথা বলার অধিকার। আমি কথা বলবো আমার ভাষায়, সেই কথাটা বোঝার দায় সমগ্র রাষ্ট্রের এমনকি তার সর্বোচ্চ সংস্থা রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত। আমার কথা বোঝানোর দায় আমার নয়। যে রাষ্ট্র আমার কথা বুঝতে অক্ষম সেটা আমার রাষ্ট্র হবার যোগ্যতাই অর্জন করেনি, কাজেই সেই যোগ্যতা অর্জনের দায় রাষ্ট্রের, আমার নয়। আমার দায়, আমার কথা বলার অধিকার প্রয়োগ করা। এই সোজাসাপ্টা ধারণাটর ওপরই মাতৃভাষার বনিয়াদ রচিত হয়েছে।

বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলছেন যে, ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে কোন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ভাষা বলে স্বীকৃতি নেই। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রমিত নয় বলেই অশুদ্ধ হয়ে যায় না। উপভাষাও অশুদ্ধ নয়।

গোটা বিশ্ব জুড়েই ভাষা নিয়ে বহু লড়াইয়ের গৌরবগাথা বিপুল। বরং বলা ভালো সব মাতৃভাষাই একটা নিজস্বতা সম্বলিত আবেগকে ধারণ করে। সিলেটি প্রতিবেশীর সাথে সিলেটি কায়দায়, চাঁটগায়ে চাঁটগায়ের কায়দায়, আবার মুর্শিদাবাদে মিষ্টি মুর্শিদাবাদী টান বা বীরভূমের নিজস্বতার টান সব আমাদেরই জন্য; আমাদের সংস্কৃতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই নাড়ীর টানকে অস্বীকার করানো হয়তো যায় সাময়িকভাবে, কিন্তু স্থায়ীভাবে সেই নাড়ীর টানে মানুষ সাড়া দেবে এটাই বিজ্ঞান। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ছাত্ররা যে মশালটা জ্বালিয়ে ছিল, যার পরিণতিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করে গোটা বিশ্বকে জানান দিচ্ছে---সাবধান মাতৃভাষাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরো না, জান যাবে, তবু জবান যাবে না।

সভ্য দুনিয়ার স্বঘোষিত ইজারাদার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে এসে সাদা আর কালো চামড়ার ছাত্ররা এক স্কুলে পড়াশোনার অধিকার পেল। তার আগে কালো চামড়ার ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক স্কুলে পড়াশোনার কিছু

ব্যবস্থা ছিল। সেইসব স্কুলে Black English Venacular (BEV) চালু ছিল। যখন ১৯৬০-এর পর একই স্কুলে পড়াশোনা শুরু হলো তখন শিক্ষকরা BEV দের জন্য তিরস্কার করতে থাকেন, ফলে তারা কিছুটা চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন সেই সাদা চামড়ার তাত্ত্বিকরা প্রচার করে যে, কালো চামড়ারা নিম্ন মেধাসম্পন্ন। সেই প্রচার আজও সমান তেজে চলছে বিত্তবানদের পক্ষ থেকে; যার জ্যান্ত প্রতিমূর্তি মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং।

ভারতের ২২ কোটি সহ বিশ্বে ৩০ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা। বিশ্বে চতুর্থ স্থানে আছে বাংলা। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা হলো বাংলা। বাংলা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের সন্তান।

বর্তমান উগ্র আর্থসামাজিক আগ্রাসনের পরিমণ্ডলে সব থেকে বেশি আক্রমণ মাতৃভাষার উপর। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজতাত্ত্বিক পি সাইনাথ কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট (CPJ)-র প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন যে ১৯৯২ সালের পর থেকে অর্থাৎ এদেশে নয়া উদার আর্থিক নীতি চালু হওয়ার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২৭ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। ২০১৭ সালে ৫ সেপ্টেম্বর সেই তালিকার সর্বশেষ নামটি হলো গৌরীলঙ্কেশ। এর আগে আক্রমণ নেমেছে নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে, এম এম কালবুর্গির ওপর। এই হিংসার পথ ধরেই এদেশের উগ্র অসহিষ্ণু ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের চালকেরা অগ্রসর হচ্ছে। সবই খুল্লামখুল্লা, এমনকি দেশের সাংবিধানিক পদে বসেও এই অনাচার করতে এতটুকু পিছপা নয়। যাই হোক পি সাইনাথ লিখছেন যে, এই যে প্রায় ২৭ জন সাংবাদিক খুন হলেন তারা প্রায় সবাই ভারতীয় ভাষায় সাংবাদিকতায় যুক্ত ছিলেন এবং স্থানীয় ভাষায় ক্ষমতাবানদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজনও পাওয়া দুষ্কর যিনি ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতা করেন। ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রগুলি সবই প্রায় বৃহৎ কর্পোরেট মিডিয়া হাউসের দখলে।

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ ও নারী সমাজ

অশোক পাত্র
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

(পূর্বপতী সংখ্যার পর)

মহান নভেম্বর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিন বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি মার্কস ও এঙ্গেলসের উপরোক্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলিকে ধারণ করে নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে তাকে বৈপ্লবিক ভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখান। ইতিহাসে এর আগে যার কোন নজীর নেই। আগেই আলোচিত হয়েছে যে, আবহমানকাল ধরে নিষ্পেশিত নারী সমাজের মুক্তি ও সমানাধিকারের ক্ষেত্রে লেনিন এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যা সারা পৃথিবী ব্যাপী নারীমুক্তি আন্দোলন তথা শ্রমজীবীদের আন্দোলন সংগ্রামে বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ সারা দুনিয়াব্যাপী অত্যাচারিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শোষিত নারী স্বাধীনতা নারীর মুক্তি ও সমানাধিকারের প্রশ্নে লেনিনের যে ঐতিহাসিক কথোপকথন বা আলোচনা তা থেকে মহান নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় কী কী ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। লেনিনের ভাষায় ''মানব সভ্যতার সামাজিক অবস্থানে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় অর্ধেক। আর সেই অর্ধেক জনসংখ্যাকে বঞ্চিত-অবহেলিত, অবদমিত রেখে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনোই সামনের দিকে এগোতে পারে না। সেজন্য সামাজিক সাম্য ও অগ্রগতির স্বার্থে এই অর্ধেক জনসংখ্যার যে মানব সম্পদ বা তার যে শক্তি সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রগতিশীল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করে দিতে হবে। আবার বিপ্লবের যে বিপুল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তাকে ধারণ করেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিপ্লবের যারা রূপকার সেই বিপ্লবীদের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নারী মুক্তি বা স্বাধীনতা সমানাধিকারের প্রশ্নে যেসব প্রচলিত পশ্চাদগামী ধারণা মানসিকভাবে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক স্তরে নারী সমাজকে কূপমণ্ডুকতায় ভরে দিয়েছে যুগপৎ তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের চেতনার বিকাশের লক্ষ্যে।'' নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি বা সমানাধিকার প্রসঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যা কিছু নারীকে পশ্চাদপদ অবস্থায় বন্দী করে ক্রীতদাসী করে রেখেছিল তার কোনটাই লেনিনের দৃষ্টি এড়ায়নি, নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক, বিবাহ প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার বা ব্যাভিচার অবিবাহিত বা কুমারী মাতার সামাজিক অমর্যাদা লাঞ্ছনা ও সামাজিক বৈষম্য গর্ভধারণের অধিকার, যৌনতা, গণিকাবৃত্তি নারীদের কম মজুরী দেওয়া, তাদের ভোটাধিকার না থাকায় তাদের সামাজিক দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা ও গর্ভধারণ বা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা গৃহস্থালীর কাজে ক্রীতদাসী করে রাখা কোনটাই লেনিনের নজর এড়ায়নি।

লেনিন প্রখ্যাত জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে যৌন সমস্যা ও যৌন নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলোচনায় খুব স্পষ্ট করে মার্কস ও এঙ্গেলস কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া ব্যাখ্যা—''সর্বহারারা নাকি সাম্যবাদী ব্যবস্থায় নারীদের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়;'' তার কঠোর সমালোচনা করে যেভাবে বলেছেন যে বুর্জোয়ারা তাদের স্ত্রীদের শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র আর গৃহ কাজের ক্রীতদাসী হিসেবে দেখে। তাই তারা যখন শোনে যে উৎপাদনের যন্ত্রগুলি সব সামাজিক সম্পদে পরিণত হবে তখন তারা এছাড়া আর কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে, 'নারীরাও সর্বসাধারণের ভোগ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে।'' কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস এই সমালোচনাকে নস্যাৎ করে দৃঢ়ভাবে আরো জানিয়েছেন যে ''একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান বা উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত নারীদের সাধারণের ভোগ্যা হিসেবে ব্যবহারের প্রথারও বিলোপ হবে—বিলোপ হবে প্রকাশ্য ও গোপন বেশ্যাবৃত্তির।'' এই উদ্ধৃতি তুলে ধরে লেনিন জেটকিনকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে 'তথাকথিত এক গ্লাস জল পান করার থিওরি' সর্বহারা বিপ্লবীরা কখনোই স্বীকার করে না, বা মেনে নিতে পারে না। ব্যাখ্যা করে বলেন যে কোন সর্বহারা মতাদর্শে দীক্ষিত বিপ্লবী যুবক যদি একটা প্রেমের সম্পর্ক থেকে আর একটা প্রেমের সম্পর্কে অথবা যৌন সম্পর্কে জড়ায় আর প্রতিটি মেয়ের পেছনে ছোটে বা প্রত্যেক যুবতী মেয়ের ফাঁদে পড়ে তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি সে আর যাই হোক বিপ্লবী হতে পারে না... না না বিপ্লবের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'' এবং যুবতীদের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। অর্থাৎ তারাও একজন যুবক বা পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের পেছনে ছুটলে তা বিপ্লবী সত্তার চরম ক্ষতিকারক।

বিপ্লব দাবী করে অভিনিবেশ শক্তির বৃদ্ধি জনগণের কাছ থেকে, ব্যক্তির কাছ থেকে। ক্ষয়িষ্ণু নায়ক নায়িকাদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সেইরকম প্রমোদোন্মাদ অবস্থা বিপ্লব কখনো সহ্য করতে পারে না। যৌন জীবনে লাম্পট্য হলো বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য, সর্বহারারা হলো একটি উদীয়মান বিপ্লবের পক্ষের শ্রেণী। এদের পক্ষে নিস্তেজক বা উত্তেজক কোন ওষুধেরই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই যৌন আতিশয্য বা মাদক দ্রব্যের। এরা কখনোই ভুলবে না—কিছুতেই ভুলবে না ধনতন্ত্রের লজ্জা, ক্লেদ, ক্রূরতা। কেননা শ্রেণীহীন শোষণহীন ব্যবস্থা, স্থাপনের সর্বহারা মতাদর্শ থেকেই তারা সংগ্রাম করার প্রেরণা লাভ করে।'' কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে নারীদের মধ্যে যাঁরা আইনবিদ, সরকারি চাকুরী বা কারখানায় কর্মরত, ডাক্তার শিক্ষিকা প্রভৃতি তাঁরাও দুভাবে শোষিত হন। কেননা তাঁদের কর্মস্থলে তাঁরা মালিকের দ্বারা শোষিত আবার বাড়িতে গৃহস্থালী কাজের জন্য

শোষিত অন্যদিকে তাদের সন্তানরা অবহেলিত— তাদের দেখাশোনা, লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব কিছু থেকেই মায়েরা দূরে থাকতে বাধ্য হয়। এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তখনো পর্যন্ত এরকম কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এই অবস্থা চলেছিল—আর লেনিন সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের পরের দিন যে ঐতিহাসিক ডিক্রীগুলি, যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের সামাজিক মালিকানা, বিনা ক্ষতিপূরণে জার সহ জোতদার জমিদারদের ও অভিজাতদের গির্জার বা যাজকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা, ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার অবলুপ্তি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সাংস্কৃতিক অধিকার, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের মৌলিক অধিকার প্রদানসহ সর্বোপরি কাজ পাবার অধিকার—কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক বা মজুরী পাওয়ার অধিকার এবং বিশ্রামের অধিকার দানের পাশাপাশি নারীদের মুক্তি সম্পর্কে যে ডিক্রি বা আইনগুলি জারী হয়, আগেই আলোচিত হয়েছে যে তা শুধু বৈপ্লবিক বা ঐতিহাসিকই নয় নজিরবিহীনও বটে। যা তখনো পর্যন্ত অগ্রসরমান বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলি করতে পারেনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তাই করে দেখালো। প্রথমত সর্বজনীন ভোটাধিকার, দ্বিতীয়ত স্ত্রী পুরুষের সমান মজুরী, তথাকথিত অবৈধ বা বিধবা এবং অবিবাহিতা মায়েদের সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা দান। কুমারী মায়েদের তথাকথিত জারজ সন্তানদের জন্য যে অমর্যাদাকর পার্থক্য ও আইনী বৈষম্য ছিল তার অবসান ঘটিয়ে তাদের মাতা ও সন্তানকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, অবৈধ গর্ভধারণকে বৈধতা দান, সর্বোপরি বুর্জোয়া ব্যবস্থার কলুষতা, অত্যাচার অবমাননার মূল উৎস পূর্বের 'বিবাহ বিচ্ছেদ' প্রথাকে সোভিয়েত সরকার সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ সাধন করতে সমর্থ হয়। শিশুদের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয় এর পূর্বে অন্য কোন দেশেই শ্রমজীবী নারীরা এরকম পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বা সমান অধিকার পায়নি। ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে তো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর নারীরা নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তীতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীদের সর্বজনীন ভোটাধিকার পাওয়ার অনেক পরে তা লাভ করে। তাও আবার সর্বজনীন নয় খণ্ডিত। বলাবাহুল্য লেনিন নিজেই জানিয়েছিলেন যে আইন করলেই অধিকার অর্জিত হয় না বা তা পাওয়া যায় না—তার জন্য প্রয়োজন অবিরাম সংগ্রামের। যেমন রাশিয়ার শহর ও কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিবাহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় আইন কার্যকর হলেও গ্রামাঞ্চলে তা কাগজে কলমেই থেকে গেছিল। তখনো সেখানে গির্জা নিয়ন্ত্রিত বা অনুমোদিত বিবাহ প্রথাই চলছিল। পাদরীদের বা ধর্মীয় সংস্কার বা কুসংস্কারই এর বড় বাধা, তাই ধর্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে খুব সাবধানে এগোনোর প্রয়োজন—সরাসরি মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। প্রচার ও শিক্ষার মধ্য দিয়েই চেতনা উন্মেষের এই সংগ্রাম চালাতে হবে। এ নিয়ে উগ্রভাব বা গোঁড়ামি দেখালে জনগণ বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে এবং তাতে তারা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে অথচ একতাই হলো শ্রমজীবীদের শক্তি—দারিদ্র ও অজ্ঞততাই হলো ধর্মের গোঁড়ামির গভীরতম উৎস, তাই এইসব ক্ষতিকর বিষয়ের বিরুদ্ধেই সর্বহারা শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ধর্মকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দ্বারা শ্রমজীবীদের ঐক্য ও সংগঠন ভাঙার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মার্কস, এঙ্গেলস অথবা মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার লেনিন নারী মুক্তিসহ সমগ্র সামাজিক শোষণ মুক্তির যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন তা কতটা সঠিক। মহান নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তীতে দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং মহান নভেম্বর বিপ্লবের অসাধ্য সাধনে নারীরা ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা প্রতিপালন করেছিলেন। গণিকা বৃত্তি লোপ পেয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের পর। জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে আলোচনায় বা প্রথম সারা রাশিয়া শ্রমিক সম্মেলনের বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রে, যা এই মুহূর্তে আমাদের দেশে চলছে সেখানে শুধু মুখেই সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কাজের বেলায় একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশে বা অগ্রসর ধনতান্ত্রিক সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতেও মানব জাতির অর্ধেক যে নারী সমাজ তাদের পুরুষের সমানাধিকার অথবা পুরুষদের শাসন ও দমন থেকে মুক্তি দেয়নি। মহান ফরাসি বিপ্লবের দুই শতাব্দী পরেও সেখানেও অবস্থা নারী শোষণের ক্ষেত্রে বা নারী মুক্তির প্রশ্নে খুব একটা বদলায়নি।

বর্তমানে সেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থর নির্মাণে প্রয়োগজনিত বিশাল ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে নারীদের সমানাধিকার বিপুলভাবে খর্বিত—সেখানে গণিকা বৃত্তি চলছে প্রকাশ্যে। আর তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন তার ভুল প্রয়োগের জন্য। যা স্বয়ং সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা নয়।

একটি প্রচলিত কথা আছে আইনত নারীদের কতখানি সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—এই হলো সভ্যতার অগ্রগতির সবচেয়ে বড় মাপকাঠি, একথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। এই দিক থেকে দেখলে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সেই কাজ করে সভ্যতার উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং পেরেছেও। এ প্রসঙ্গে স্তালিনের নারী জাতি সম্পর্কিত একটি বিষয় উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে ''ফ্যাসিস্ট নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ থেকে মাতৃভূমি তথা সারা পৃথিবীকে রক্ষা করার কাজে সোভিয়েতের নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার মূল্য অপরিমেয়। যুদ্ধক্ষেত্রের কাজের জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিয়েছেন। যুদ্ধকালীন কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে আমাদের লাল ফৌজের সেনানীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।''

লেনিন বলেছেন সর্বহারা শ্রেণীর সবচেয়ে প্রগতিশীল বা অগ্রসর কমরেডরাও নারীরা এটা পারল না, এটা করলো না বলে বাগাড়ম্বর করে, কিন্তু অন্যের কথা বাদ দিয়ে আমাদের নিজস্ব সংগঠনের কতজন পুরুষ কমরেড মহিলাদের সম্পর্কে মনে এবং কাজে সহানুভূতিশীল? ক'জন, নারীরা এই ভুল, সেই ভুল করলো না বলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়? এও কঠোরভাবে সমালোচনার যোগ্য। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই প্রতিবন্ধকতাতে মিত্রতাসুলভ আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে কাটাতেই হবে। না হলে আমরা এগোতেই পারবো না। তাই পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য আদর্শ শিক্ষাসহ অনান্য প্রতিষ্ঠান, ভোজনালয়, শিশুদের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ক্রেশ, সৈন্যদের সামাজিক বিষয়ে ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা বা যোগান দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলির দ্বারা মেয়েদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে। এই অগ্রসরমান প্রগতিশীলদের একটু খোঁচা দিলেই তাদের সম্পর্কে সঙ্কীর্ণতা নানা দিক থেকে বেরিয়ে আসে যা নিতান্তই অনভিপ্রেত।

শ্রমিকদের মুক্তি যেমন শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই আসে, ঠিক তেমনি নারী শ্রমিকসহ নারী মুক্তিও তাদের নিজেদের আনতে হবে— শোষণমূলক এই আর্থ সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের দ্বারা। শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করা—শুধু মামুলি বা আনুষ্ঠানিক সমানাধিকার নয়। এর প্রধান কাজ সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে তাদের টেনে আনা, নারীদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, অনন্তকাল ধরে কেবলমাত্র রান্নাঘর আর আঁতুর ঘরের কাছে নির্বোধ অবমাননাকর বশ্যতা থেকে তাকে মুক্ত করা। যা নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় বাস্তবে কার্যকরী হয়েছিল। তাই নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা হলো নারীমুক্তি—নারী সমানাধিকারের লক্ষ্যে সমস্ত বুর্জোয়া ও পশ্চাদপদ মানসিকতা পরিত্যাগ করে তাদের সামাজিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম জারী রাখা।

বর্তমানে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারীর সমানাধিকার বা ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্রাজ্যাদী লগ্নী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত নব্য উদার আর্থিক নীতির ধারক ও বাহক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে আমাদের দেশের সংবিধান স্বীকৃত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাকে চরমভাবে খর্ব করে চলেছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন চরম দক্ষিণপন্থীদের ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নারীর ক্ষমতায়ন বা সমানাধিকারকে স্বীকৃতি তো দেয় না বরং ১৫০০ বছর আগেকার মনুসংহিতাই তাদের নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দেয়। যা বর্তমান আধুনিক নারী সমাজকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঠেলে দিতে বদ্ধ পরিকর। তাদের মত হলো নারীরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, তাদের কাজ রান্নাঘরে আর পুরুষের সেবা করা। ঘর ওয়াপসি-লাভ জিহাদ সম্মান রক্ষার নামে খুন, দলিত আদিবাসী, সংখ্যালঘু মুসলিমদের পাশবিক ধর্ষণ ও হত্যালীলা তাদের সেই পশ্চাদগামী ঘৃণ্য মানসিকতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে। আর আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গ মেয়েদের উপর নির্যাতনে সারা দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। চলেছে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বিপন্ন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নব্য উদার আর্থনীতির আক্রমণে আক্রান্ত, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি। এর জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে চাই সুদীর্ঘ তীব্র সংগ্রাম, চাই এই সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন। মহান নভেম্বর বিপ্লব আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। □

আন্তর্জাতিক নারীদিবস ২০১৮

শোষণমুক্তির স্বপ্ন চোখে ঝড় তুলুক অর্ধেক আকাশ

কুমকুম মিত্র

প্রতিবছরই ৮ মার্চ তারিখটি সারা বিশ্বের মহিলাদের জীবনে আসে দু-চোখ ভরা নতুন নতুন স্বপ্ন নিয়ে, আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে। এই দিনটি আমাদের লড়াইয়ের দিন, প্রত্যয়ের দিন, সমান অধিকার আদায়ের শপথের দিন। পাশাপাশি এই দিনটিতে আমরা স্মরণ করি সেই সমস্ত লড়াকু শ্রমজীবী নারীকে যাঁদের সংগ্রামী ভূমিকা ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর যুগান্তকারী ভূমিকা পালন প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস বলেন—"শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হলে শোষিত নারী সমাজের প্রশ্নকে অবহেলা করা যায় না।" ১৮৬৪ সালে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে কার্লমার্কস শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সাথে নারীর অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁরই উদ্যোগে শ্রমজীবী নারীদের ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য করা হয় এবং তাদের সমান অধিকারের দাবি ঘোষণা করা হয়। এই সময়ের পর থেকেই ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে নারী শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে থাকেন এবং প্যারী বিপ্লবের সময় থেকেই শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৮৯ সালে প্যারি শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের মঞ্চে বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি জানিয়ে একটি বক্তৃতা শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ক্লারা জেটকিন সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দরজি নারী শ্রমিকদের সারা জাগানো ঐতিহাসিক ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনের পর থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হতো। ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

এই দিনটি আমরা আরো স্মরণ করি চোখে শোষণমুক্তির স্বপ্ন নিয়ে। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীরা শোষিত হয় মূলত নারীরূপে, শ্রমিকরূপে এবং নাগরিকরূপে। নারীর এই অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের পাশাপাশি নারীদের লড়াইকেও একই সুতোয় বাঁধতে হবে। মেয়েরা লড়াই করে মূলত শান্তির সুস্থিতি বজায় রাখার জন্যে। কিন্তু এ লড়াই মহিলাদের একার লড়াই নয়। সমাজের অর্ধেক আকাশ যেমন নারী, তেমনি বাকী অর্ধেক আকাশ পুরুষ। সুতরাং এ লড়াই নারী-পুরুষ উভয়ের। মহিলাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে বেশি মাত্রায় যুক্ত করতে না পারলে আমাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজও কখনো সফল হবে না। যে কোনো সংগ্রাম আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ও লড়াই-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। মহিলা ও পুরুষের দৈহিক

গঠনগত কিছু পার্থক্য থাকলেও সাহস, দৃঢ়তা ও কর্মসূচী রূপায়নে আন্তরিকতার অভাব কিন্তু মহিলাদের মধ্যে নেই। এমনকি মেধাও পুরুষের থেকে মহিলাদের কিছু কম নয়। এটা ঠিকই যে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের ফলেই অনেক সময় মহিলাদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশলাভ সম্ভব হয় না এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা সম্ভবও নয়। সেই কারণে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পচাগলা সমাজের পরিবর্তন আনে নারীর পূর্ণমুক্তি। আমরা জানি ১৯১৭ সালে ৮ মার্চ রাশিয়ার পেট্রোগাদে স্বৈরতন্ত্রী অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী নারীরা সভা ও মিছিল করে প্রতিবাদে শামিল হন। ১৯৩৬ সালে স্পেনের লাপাশিওনারার (ডলোরাস ইবারুরি) নেতৃত্বে ৮ই মার্চ আশি হাজার শ্রমজীবী নারীর ফ্যাসিস্ত ফ্র্যাঙ্কো বিরোধী শোভাযাত্রা মাদ্রিদ শহরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল। ১৯৫০ সালের ৮ মার্চ পশ্চিম জার্মানির তিন লক্ষ নারী চ্যান্সেলর আদেনুরকে শান্তির দাবিতে পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের সাথে সাথে আমাদের দেশেও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক মানুষজন যে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন বিভিন্ন সময়ে, তা সে জমির আন্দোলনই হোক অথবা শ্রমিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন বা দাবি আদায়ের আন্দোলন, সর্বত্রই পুরোভাগে ছিলেন মহিলারা। সে ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এই ৮ মার্চ দিনের ইতিহাস। পাশাপাশি আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহিলাদের লড়াকু অবস্থান স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের লং মার্চ-এ কৃষকরমণী সক্কু বাইয়ের অংশগ্রহণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সংগ্রাম আন্দোলনের। দীর্ঘপথ হাঁটার মধ্যে দিয়ে তাঁর পায়ের তলার চামড়া ফেটে-ছিঁড়ে গেছে তবুও তিনি থমকে যাননি। শেষ পর্যন্ত হেঁটে তিনি বিজয়ের হাসি হেসেছেন। সত্যিই তিনি আমাদের কাছে একজন গর্বের মানুষ।

শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও বাস্তবে নারীর সমানাধিকার তো আজও পূর্ণতা পায়নি। নারীরা এখনো সমাজে একদিকে শ্রেণীশোষণ, অপরদিকে গার্হস্থ্য শোষণ, দুভাবেই শোষিত হচ্ছেন। নারীদের সবসময় অধীনতা বজায় রেখে চলতে হয়। নারীদের সবসময় সামাজিক উৎপাদনের কাজে যুক্ত করার ও গার্হস্থ্য কাজ থেকে মুক্তির কথা বলেছিলেন লেনিন। ২০১৫ সালের রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে শ্রমজীবী অংশের মধ্যে পুরুষ ও নারীর প্রভেদ ঘোচানোর প্রয়োজন বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কাজের ঘণ্টা সমান হলেও, মেয়েদের ঘরের কাজকে কখনই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। কোন উন্নত দেশে সাধারণত একজন মহিলা প্রতিদিন পুরুষের চাইতে ৩০ মিনিট বেশি কাজ করেন, আর উন্নয়নশীল দেশে কাজ করেন ৫০ মিনিট বেশি। ক্রমাগত সঙ্কুচিত কাজের বাজারে পুরুষের জন্য যদি স্থায়ী কাজ থেকেও থাকে, তো মহিলাদের জন্য বরাদ্দ অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক নানান শর্ত আরোপিত কাজ। সাধারণত সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে মাত্র ৬ শতাংশ শ্রমজীবী, বাকী ৯৪ শতাংশ অসংগঠিত শ্রমজীবীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী। কর্মী সঙ্কোচন হলে কোপ পড়ে প্রথমেই নারীদের ওপর। তার ওপর বেতন ও মজুরী বৈষম্য তো আছেই। কেন্দ্রীয় বাজেট অর্থমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে সংসদে পেশ করলেও বাস্তবে কিছুই নাই। পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেনি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে মহিলাদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় প্রাথমিকভাবে। কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দে মহিলাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মোট বাজেট

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পি এন বি কেলেঙ্কারি ঃ দায় এড়াতে পারেন না প্রধানমন্ত্রীও

উৎসর্গ মিত্র

বছর দুয়েক আগের ঘটনা। দেশের তাবৎ শিল্পপতি, বলিউডি তারকা, ফ্যাশন ডিজাইনার আর ঝাঁকে ঝাঁকে উচ্চবিত্ত মানুষ জড়ো হয়েছেন যোধপুরের উমেদ ভবনে। যেমন রাজকীয় পরিবেশ, তেমনই রাজকীয় আয়োজন। প্রাসাদের ল'নে ইতি-উতি সুন্দরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাজা ফুলের পোশাক পরে, আয়োজকদের সবারই গায়ে বহুমূল্য হীরের গয়না ঝলসাচ্ছে, যেমন তাদের ডিজাইন, তেমন তাদের সৌন্দর্য—একটা চোখ ধাঁধানো ব্যাপার চলছে সেখানে, একটা স্বর্গীয় পরিবেশ। পার্টি চলছে—হীরের গয়নার পাশ্চাত্য ব্যারণ কার্টিয়ারের ভারতীয় সংস্করণ নীরব মোদীর কোম্পানির পাঁচ বছর পূর্তির পার্টি চলছে সেখানে। আর বছর দুই পর? সেই নীরব মোদী এখন সপরিবারে দেশের বাইরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেশের ব্যাঙ্কের এগারো হাজার চারশো কোটি টাকা স্রেফ মেরে দিয়ে, আর তাই নিয়ে এখন গোটা দেশে তোলপাড় চলছে, প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে দেশের গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাটাই। অথচ, এই সেদিন, মাত্র ২০১০ সালে যখন মূলতঃ বেলজিয়ামে হীরের ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান নীরব যখন এ দেশে তাঁর হীরের ব্যবসা শুরু করেন, তখন মানুষের রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল সেগুলোর শিল্প সুষমা দেখে। মূলতঃ সৌন্দর্য আর দামের জন্যেই 'নীরব মোদী কালেকশন'-এর গয়না দেশের ধনীদের কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

গল্পের শুরু এখান থেকেই। ধনিক শ্রেণীর যা মজ্জাগত, সেই কম পরিশ্রমে বেশি মুনাফার লোভ দ্রুত বাসা বেঁধে ফেলে মোদীর মনে। এ ব্যাপারে তার সাথে যোগ্য সঙ্গত দিতে এগিয়ে আসে তারই মামা মেহুল চোক্সি। মেহুলেরও এ দেশে হীরের গয়নার ব্যবসা 'গীতাঞ্জলী' ব্র্যান্ড নেমে। গীতাঞ্জলীও দেশের অগ্রণী ব্র্যান্ড। বিশাল ব্যবসা তার, কিন্তু যত বড়োই হোক, লোভের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। মামা-ভাগ্নে মিলে ফন্দি আঁটল তাদের সুনামকে হাতিয়ার করে ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপের—ধার নিয়ে শোধ না করার। কিন্তু সে তো বহু লোকই করে! মন্ত্রী বা আমলাকে ধরো, তাদের প্রভাব খাটিয়ে এক বা একাধিক বড়ো অঙ্কের টাকা ধার নাও, তারপর একদিন সবার সামনে দিয়ে অনেকটা প্রাতঃভ্রমণের ভঙ্গীতে টুক করে বিদেশ চলে যাও বা অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ফেলো—এ আর নতুন কী? অতীতের নাম যদি না-ও ঘাঁটি, একেবারে হালেই তো আমাদের সামনে বিজয় মালিয়া বা ললিত মোদীর উদাহরণ রয়েছে। এমনি করেই তো দেশের অনাদায়ী ঋণ দশ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছে প্রায় সরকারি বাজেট ছড়িয়ে যেতে বসেছে! নীরব-মেহুল তাহলে কী এমন করলো যে সারা দেশে এমন করে হই-চই পড়ে যাচ্ছে?

হই-চই পড়ে যাচ্ছে কারণ মামা-ভাগ্নে তাদের চুরির মধ্যে দিয়ে দেশের ব্যাঙ্কিং সিস্টেমকে, তার সুরক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বে-আব্রু করে দিয়েছে। বহু লোকের, বিশেষ করে দেশের গরিব মানুষের পরম ভরসার জায়গা সরকারি ব্যাঙ্কের সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা যে ঠুনকো, সেটাই বেরিয়ে এসেছে এই মামা-ভাগ্নের কাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সে আলোচনায় আসতে গেলে তার আগে কিছু বিষয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার, নইলে ধোঁয়াশা থেকে যাবে।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার

'লেটার অব আন্ডারটেকিং' আর 'লেটার অব ক্রেডিট' বলে দুটি শব্দ আছে। যারা বড়ো ব্যবসাদার, বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা যাদের, তাদের বিদেশে টাকা ধার নিতে গেলে এই লেটার অব আন্ডারটেকিং বা LoU-এর দরকার পড়ে। ধরা যাক এখানকার কোনও ব্যবসায়ী ব্রাজিল থেকে ১০০ কোটি টাকার কফি আমদানি করবেন এবং সেটার জন্যে টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কের থেকে ধার নেবেন। ব্যাঙ্ক এ ক্ষেত্রে দুটি কাজের যে কোনও একটি করতে পারে। এক, যিনি ধার করবেন, তাঁর কাছ থেকে একটা বিশ্বাসজনক পরিমাণ কিছু একটা গচ্ছিত রেখে টাকা দেওয়া, সে গচ্ছিতের মধ্যে সম্পত্তি, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি যা খুশি হতে পারে, অথবা যদি ঋণের পরিমাণ বেশি হয় এবং বিশেষ সেটা আমদানির সাথে যুক্ত হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণকারীর আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর ব্যবসার মূল্যায়ন করে তাঁর ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ঠিক করবে এবং তার উপর ভিত্তি করে তাকে একটি 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' ইস্যু করবে। এই 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' বা মুচলেকার চিঠির ওপর ভিত্তি করে ব্রাজিলের কোনও ঋণদানকারী সংস্থা ব্রাজিলে ওই 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' ইস্যু করা ব্যাঙ্কের যে শাখা আছে সেখানে অথবা সে সংস্থা কফি বিক্রিতে সম্মত হয়েছে তাকে সরাসরি ওই ১০০ কোটি ডলার দিয়ে দেবে। ব্যবসায়ী আমদানি করা কফি দেশে এনে বিক্রি করে এখানে তার ব্যাঙ্ককে সুদ সমেত ১০০ কোটি টাকা জমা করে দেবে এবং ব্যাঙ্কও ওই টাকা ব্রাজিলে পাঠিয়ে দেবে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক এ ক্ষেত্রে গ্যারান্টারের কাজ করে। অবশ্য এই আমদানি আর টাকা জমা দেওয়ার মধ্যে ব্যাঙ্ক একটা সময়সীমা বেঁধে দেয়। নীরব-মেহুল টাকা নিয়েছিল ঠিক এই পথ ধরেই এবং এ কাজে তারা ব্যবহার করেছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে। মুম্বাইতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ব্র্যাডি হাউস শাখার থেকে 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' ইস্যু করা হয়েছিল—এক বার নয়, দেশীয় সাতটি ব্যাঙ্কের জন্য ১৪০ বার আর বিদেশী ব্যাঙ্কের জন্য ২০০ বার 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' ইস্যু করেছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এই ব্র্যাডি হাউস শাখা, যেগুলোর সাহায্যে পাওয়া টাকার পরিমাণ এগারো হাজার চারশো কোটি!

এই বিপুল পরিমাণ টাকা যদি সরাসরি পি এন বি-র কাছ থেকে নেওয়া হতো, তাহলে অবশ্যই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নজরে সেটা আসতো, কিন্তু সেটা হয়নি। যে 'লেটার অব আন্ডারটেকিং'গুলো বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে ইস্যু করা হয়েছিল, সেগুলোর প্রত্যেকটাতেই লেখা ছিল যে এই টাকা যদি নীরব মোদী বা গীতাঞ্জলী গ্রুপ ফেরত দিতে না পারে, তাহলে গ্যারান্টার হিসেবে পি এন বি সেই টাকা শোধ করে দেবে। ফলে যাদের এই লেটার দেওয়া হয়েছিল, তারা নিশ্চিন্তে টাকার যোগন দিয়ে গেছে আর এখন নীরব-মেহুলের অনুপস্থিতিতে বকলমে সমস্ত দায় এসে বর্তেছে পি এন বি-র ঘাড়ে। মজা হচ্ছে, এই ধরনের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্যে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী আমদানি সংক্রান্ত যা যা কাগজ-পত্র জমা দিতে হয়, তার কোনও কিছুই কোনও দিন চাওয়া হয়নি এই তস্কর যুগলের কাছ থেকে। নয় নয় করে সাত বছর ধরে চলেছিল এই কাজ। হয়তো আরও বেশ কিছু দিন এমন চলতেই থাকতো, যদি না ব্র্যাডি হাউস শাখার কর্মীদের রুটিন ট্রান্সফার ইতোমধ্যেই ঘটে যেত। এ বছর ১৬ জানুয়ারি নীরব-মেহুলের প্রতিনিধি যখন আবার ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' নিতে যায়, তখন এই নতুন কর্মচারীরা বিনা কাগজে তা দিতে অস্বীকার করে, কারণ ইতোমধ্যেই এই গ্রুপের কাগজপত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু অসঙ্গতি তাদের নজরে এসেছিল। বিনা কাগজে 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' দেওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতে এদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় এবং তারা গোটা বিষয় ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানায়। শুরু হয়

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

এই প্রবণতা আমাদের প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রেও (বাংলাদেশ ও পাকিসস্তান) চরিত্রের দিক থেকে একই, সেখানেও মুক্তিচিন্তার লেখকদের খুন একটা ধারাবাহিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে খুন হন অনক্ষম মুনীর রাজা। ৬টা গুলি করে দুষ্কৃতিরা। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৩ মার্চ বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই গুলিবিদ্ধ হন, সুপরিচিত লেখক অধ্যাপক জাফর ইকবাল। এরই প্রতিবাদে আবারও উত্তাল হয়ে হয়ে উঠেছে শাহবাগ। প্রসঙ্গত ৩ মাচ ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটনাতেও আক্রান্ত সেই ভাষা, আক্রান্ত জাত্যাভিমান, আক্রান্ত সুস্থ সংস্কৃতি।

তাই আমাদের কাছে একুশে শুধু কিছু ইতিহাস চর্চার বিষয় নয় বরং সমকালীন বাস্তবতায় একুশের শপথকে কার্যকর করার পথ অনুসন্ধানই আমাদের করণীয়। সর্বগ্রাসী যে আগ্রাসন চলছে তাতে সভ্যতার সব বৈচিত্র্যকে একটা ছাঁচে ঢেলে গড়তে চাইছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। বৈচিত্রকে রক্ষার লড়াই। সম্প্রতি 'এথবোলগ' প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৭১০৫টি ভাষার মধ্যে প্রায় ৩৫০০টি ভাষা শেষ হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই আমাদের একুশের শপথ। একুশ শতকের জ্বলন্ত মশাল একুশে ফেব্রুয়ারিকে বহন করার দায় আমাদেরই নিতে হবে এবং আমরা সেই দায় নেব।

একুশে ফেব্রুয়ারি মানে মৌলবাদের বিরুদ্ধে বহমান সংগ্রাম। বর্তমানে যখন গোটা দেশ এমনকি গোটা বিশ্ব জুড়েই একটা মৌলবাদী বাড়বাড়ন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো লড়াই করছে একুশে ফেব্রুয়ারি। তাই তো মুক্তি চিন্তার কুশীলবদের উপর মৌলবাদী শক্তির এত নৃশংস আক্রমণ। বাংলাদেশে ব্লগার খুন প্রমাণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি আজও জীবন্ত।

অমর একুশে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটা একুশের উত্তাপে মুক্ত হয়েছে। যার পরিণতিতে রাজনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের পথ প্রসস্থ করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে। এটাই হলো ইতিহাস যাকে বর্তমানের মৌলবাদী শক্তির দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে কথাটা না বললে অন্যায় হবে যে বাংলাদেশেরই তরুণরা 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' এই শ্লোগান তুলে 'অভ্র' নামে সহজ বাংলা ফন্ট আবিষ্কার করেছেন যা বিশ্বের নেট দুনিয়ায় বাংলার বিচরণকে অবাধ করেছে। সম্প্রতি ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ববিদ হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডেভিড সুলেমান বলছেন, 'There is no Language in the world which is pristine and pure. পৃথিবীর নরগোষ্ঠী যেমন মিশ্র, তার মধ্যে বিশুদ্ধতা খুঁজতে যাওয়া পশ্চাদপদতা ছাড়া কিছুই নয়, তেমনই ভাষার ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে সত্য। ভাষা গোষ্ঠী থেকে জাতিগোষ্ঠীর ধারণা এটা ধারণামাত্র, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর প্রমাণ দুস্কর। এমনকি ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ বর্ণ, তারও প্রাচীনত্ব ও নতুনত্ব আছে। ইংরেজি শব্দমালায় 'O' যেমন সব থেকে প্রাচীন বর্ণ তেমনিই 'J' 'V' এগুলি শেক্সপিয়ারের যুগের পরবর্তীতে বর্ণমালায় যুক্ত হয়েছে।

আমাদের বাংলার ভাণ্ডারেও বহু ভাষা প্রতি মুহূর্তে আত্তিকরণ করেই চলেছে। একইভাবে জীবন্ত একুশে ফেব্রুয়ারির মশাল হাতে একঝাঁক মহিলারাও অন্তপুরের বাঁধন ছিড়ে মুক্তির বিজয় কেতন ওড়াতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই একুশের সর্বজনীনতা, সর্বগামিতা, সবল বহমানতা। সেই একুশের বহমান স্রোতে নিজেদের সদা প্রস্তুত থাকার শপথ নেওয়াই হবে একুশের স্বার্থকতা। বর্তমানে ১৯৫২ সালের প্রেক্ষিত নেই ঠিকই কিন্তু প্রয়োজন আজও জীবন্ত। □

পি এন বি কেলেঙ্কারি

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

তদন্ত, বেরিয়ে আসে একের পর এক বিনা কাগজে গ্যারান্টির চিঠি। মাথায় হাত পড়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের, তারা সরাসরি সি বি আই-এর কাছে নীরব-মেহুলের নামে এফ আই আর দায়ের করে, কিন্তু ততদিনে মামা-ভাগ্নে সপরিবারে পগার পার হয়ে গেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন ধরে এই বেনিয়ম চলছে, অথচ কারুর সেটা নজরে এলো না? ভারতের ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মধ্যেই এর উত্তর লুকিয়ে আছে। তদন্ত করতে নেমে সি বি আই ব্যাঙ্কের নেহাতই চুনোপুঁটি ছয় অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের মধ্যে দুজন নাকি সরাসরি এই বে-আইনি 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' ইস্যুতে হাত লাগিয়েছিল। এরা এই লেটার ইস্যু করেছিল এমনভাবে, যাতে কোনভাবেই সেগুলোর কোনও হদিশ ব্যাঙ্কের মূল সার্ভারে না থাকে। ফলে ব্যাঙ্কের নজরদারির আওতায় কখনওই সেগুলো আসেনি, আর প্রশ্নটা এখানেই। আজকের এই দুর্দান্ত সাইবার যুগে এমন কাজ কী করে করা গেল, যাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ নথি ব্যাঙ্কে সার্ভার অবধি পৌঁছলোই না? পি এন বি তার কাজকর্মের জন্য 'ফিনাকেল' নামের যে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে, সেটা তৈরি করেছিল ইনফোসিস এবং এটি দেশের এই ক্ষেত্রে সব চাইতে এগিয়ে থাকা সংস্থাগুলির অন্যতম, তাহলে কেন এমন বিপর্যয় ঘটতে পারলো? ইনফোসিস কর্তারা জানাচ্ছেন, তাঁরা 'ফিনাকেল' তৈরি করেছিলেন ২০০১ সালে। তারপর ২০০৮ সালেই অতি দ্রুত বদলে যেতে থাকা সাইবার জগতের সাথে পাল্লা দিতে গেলে এই ধরনের কোর ব্যাঙ্কিং সফ্টওয়্যারের যে আপগ্রেডেশন বা উন্নয়নের দরকার থাকে, সেটিও তাঁরা করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেটিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে পি এন বি কর্তৃপক্ষ কোনোদিন কোনও উৎসাহই দেখায়নি। ফলে যা হওয়ার, সেটাই হয়েছে। 'লেটার অব আন্ডারটেকিং'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনও নথি ইস্যু করলে সরাসরি সার্ভারে সেটা পৌঁছে যাওয়ার বদলে ব্যাঙ্কেই থেকে গিয়েছে এবং থাকেও অনন্তকাল, যতদিন না পর্যন্ত ম্যানুয়ালি সেটা কেউ সার্ভারে পৌঁছে দিচ্ছে। আজকের দিনে এ ব্যাপার ভাবাই যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আরও আগে এই জালিয়াতি ধরা পড়া উচিত ছিল কারণ যে 'সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারব্যাঙ্ক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন' বা 'সুইফট'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এই 'লেটার অব আন্ডারটেকিং'গুলো পাঠানো হয়েছিল, তাৎক্ষণিক অডিটে তা ধরা পড়া উচিত। তাছাড়া কোনও একজন মানুষ বা গ্রুপের নামে পি এন বি-র বিদেশী শাখাগুলিতে কোটি কোটি টাকা জমা পড়ছে, অথচ সেদিকে কারুর নজরই পড়ছে না---এই ব্যাপারটাও বেশ বিস্ময়কর। কত দূর পর্যন্ত এই জালিয়াতির শিকড় পৌঁছেছে, সেটাও এখন এক মারাত্মক প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিচ্ছে বিশেষজ্ঞদের মনে।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সি বি আই পি এন বি, গীতাঞ্জলী গ্রুপ, অডিটর ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ১৯ জনকে এ যাবৎ গ্রেপ্তার করলেও পি এন বি যদি তাদের ঘাড়ে চেপে যাওয়া টাকা শোধ না করে, তাহলে দেশের এস বি আই, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্কের মতো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কসহ বেশ কিছু ব্যাঙ্ক বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ে যাবে, কারণ পি এন বি-র চিঠির ওপর নির্ভর করেই এরা তাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট, হংকং, মরিশাস, বাহারিন ইত্যাদির শাখায় ওই টাকা জমা করেছিল, আর নীরব-মেহুলও নির্বিবাদে সে সব টাকা সব জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিল। এখন আবার জানা যাচ্ছে যে এগারো হাজার চারশো কোটি নয়, আসলে এই দুই মামা-ভাগ্নের জালিয়াতির পরিমাণ বারো হাজার সাতশো কোটি টাকা। সি বি আই-এর পাশাপাশি দেশের এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা ই ডি তল্লাশিতে নেমে মামা-ভাগ্নের বাড়ি, দোকান ইত্যাদি থেকে সামান্য যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে, তার পরিমাণ যতই বাড়িয়ে দেখাক না কেন, তাই দিয়ে এই বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন আরও উঠছে এবং উঠবেও। প্রথম কথা, পি এন বি-র ব্র্যাডি হাউস শাখার যে ডেপুটি ম্যানেজারটিকে ধরা হয়েছে, ই ডি-র কথা অনুযায়ী যার মাধ্যমে সমস্ত বে-আইনি চিঠি যোগাড় করেছিল নীরব-মেহুলেরা, সেই গোকুল নাথ শেট্টি নামের কর্মচারীটি ওই শাখায় দীর্ঘ সাত বছর কর্মরত ছিল। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের পদে নিযুক্ত কর্মচারীদের তিন বছর অন্তর অন্তরই বদলী হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে কার অঙ্গুলি হেলনে ইনি তারপরেও একই জায়গায় বহাল থাকতে পারলেন? একেবারে উচ্চ কর্তৃপক্ষ কিম্বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া তো এমনটা হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা, ব্র্যাডি হাউসে রদবদল হয় গত বছরের নভেম্বর মাসে। তখন থেকেই বদলী হয়ে আসা নতুন কর্মচারীদের চোখে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের বিভিন্ন অসঙ্গতি নজরে আসতে থাকে। নীরব-মেহুল জানতো তারা যে কোনও সময়ে ধরা পড়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা কার ভরসায় জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দেশে থেকে যেতে সাহস পেল? তাদের পিঠে কার হাত ছিল? বিশেষ করে এখন যখন শোনা যাচ্ছে যে দেশের অর্থ মন্ত্রী অরুণ জেটলির কন্যাই নীরব-মেহুলের হয়ে মামলা লড়বেন, তখন এই প্রশ্ন আরও জোরদার হয়ে উঠছে। প্রথম দিকের 'লেটার অব আন্ডারটেকিং'এর সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক মুখেই এই দুজন দেশ ছাড়ে। খবর বলছে, গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে নীরব এবং মেহুল দুজনেই এদেশে তাদের সমস্ত কর্মচারীকে মেল করে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। মুখে তারা তাদের বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া সম্পত্তির কারণে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার অপারগতার কথা জানালেও এটা পরিষ্কার যে আসলে তারা এদেশে তাদের সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বিদেশে থাকার ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে।

অর্থমন্ত্রী নিজে অবশ্য পার্লামেন্টে বড়ো মুখ করে নীরব-মেহুলের টাকা দেশে ফিরিয়ে আনবেনই বলে কথা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কথার কোনও সারবত্তা আছে বলে মনে হয় না। এর আগে ক্ষমতায় আসার সময়ে এনারা সবাই দেশের মানুষের কাছে কথা দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে সমস্ত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার, নির্বাচনী সভাগুলোতে নরেন্দ্র মোদী হাতে তালি দিয়ে দিয়ে বলতেন এই কথা, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বিদেশী টাকা তো দূরস্থান, দেশের ঋণ খেলাপিদেরকেও উদ্ধার করার জন্য নানা কলা-কৌশল করে অবশেষে গত আগস্টে পার্লামেন্টে পেশ করেছেন 'এফ আর ডি আই' বিল, যার মোদ্দা কথাই হলো, কর্পোরেট হাউসগুলো যদি ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিয়ে শোধ না করে, তাহলে সরকারই তাদের হয়ে টাকা শোধ দিয়ে দেবে এবং এক্ষেত্রে আমানতকারীদের থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে দরকার পড়লে। এই যাদের 'কর্পোরেট প্রীতি', তারা করবে টাকা উদ্ধার!

নীরব মোদী দেশ ছাড়ে পয়লা জানুয়ারি আর মেহুল চোকসি দেশ ছাড়ে জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখে। ১৬ তারিখে গীতাঞ্জলি গ্রুপের লোকেরা নতুন করে 'লেটার অব আন্ডারটেকিং' চাইতে গেলে গণ্ডগোল বাধে। ২৯ তারিখে পি এন বি তাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর দাখিল করে। তার মানে ঐ 'গণ্ডগোল' না হলে ২৯ তারিখ এফ আই আর হতো না। অথচ নভেম্বরেই ব্র্যাডি হাউসে সমস্ত নতুন কর্মচারী এসে গিয়েছেন। তাহলে এই দীর্ঘ সূত্রিতা কেন?

পয়লা তারিখ দেশ ছাড়ার দেড় মাস পর ১৬ ফেব্রুয়ারি বিদেশ মন্ত্রক নীরব-মেহুলের পাসপোর্ট বাতিল করে দেয়। এ কাজ আরও আগে করলে মামা-ভাগ্নে দেশ ছাড়তে পারতোই না। পাসপোর্ট দেখিয়ে দেশ ছাড়ার পরে পাসপোর্ট বাতিল করার কোনও মানেই হয় না। এখন উলটে এই পাসপোর্ট বাতিলকে অজুহাত করে মেহুল দেশে ফিরবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তাকে বা তাদেরকে এই সুযোগ করে দেওয়া হলো কেন? কার ইচ্ছায় ঘটলো এটা?

এবং অবশ্যই খোদ প্রধানমন্ত্রীও ছাড় পেতে পারেন না এই ধরনের জালিয়াতির ঘটনায়। তালি মারা তাঁর অভ্যাস। সেই তালি মারতে মারতেই ক্ষমতায় আসার আগে সুর করে করে তিনি বলেছিলেন দেশের মানুষ যেন তাঁকে আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত না করে, তিনি নির্বাচিত হতে চান 'দেশের চৌকিদার' হিসেবে, যে চৌকিদার দেশের সিন্দুককে বুক দিয়ে আগলে রাখবেন। অথচ দেখা যাচ্ছে তাঁর আমলেই একের পর এক ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে আর জালিয়াতরা নিশ্চিন্তে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে। ২০১৪ সালে দেশের 'চৌকিদার' নিযুক্ত হয়েছেন তিনি, আর পরের বছর জুন মাসেই ললিত মোদী পাঁচ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ২ মার্চ, ২০১৬-তে দেশ ছেড়েছে বিজয় মালিয়া নয় হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে। চৌকিদারের ঘুম ভাঙ্গেনি, উলটে আজকের চোর মেহুলকে তিনি 'ভাই' বলে কোলে বসিয়েছেন, আর এক চোর নীরবের সাথে দাভোসে গিয়ে ছবি তুলিয়েছেন এ বছর। কোনও কথাই তিনি রাখেননি, এমনকি চৌকিদারও থাকেননি, বরং তাঁরই সঙ্গী-সাথীরা চোরেদের সাথে দহরম-মহরম বাড়িয়েছে আর তিনি যেটুকু সময় দেশে থেকেছেন, বসে বসে দেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টে ললিত মোদীর হয়ে মামলা লড়েছেন বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কন্যা বাঁশুরি স্বরাজ। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কন্যা সোনালি জেটলির সংস্থা নীরব মোদীর আইনি ব্যাপার দেখভাল করে এসেছে এতদিন, এখন শোনা যাচ্ছে আগামী দিনে হয়তো এরাই নীরবের হয়ে আইনি লড়াই করবে। অরুণ জেটলি নিজে আবার চোরেদের না ধরে জনগণের পয়সায় ঋণ খেলাপিদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো এই যে, চৌকিদার হয় অপদার্থ, নাটক করা ছাড়া আর কিছুই করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা ইচ্ছা করেই জেগে ঘুমান যাতে চোরেরা নিশ্চিন্তে পালিয়ে যেতে পারে। কেন, সেটা আগামী দিনে বলবে। কিন্তু চ্যালা-চ্যামুন্ডা সমেত এমন চৌকিদারকে প্রথম সুযোগেই বরখাস্ত করাটা দেশের মানুষের এখন পবিত্র কর্তব্য, নতুবা এই চৌকিদারই আগামী দিনে গৃহস্থের ঘর সাফ করে দেবে! □

শোষণমুক্তির স্বপ্ন চোখে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দের মধ্যে মহিলাদের অংশ ৫.২ শতাংশ থেকে কমে ৪.৯ শতাংশ হয়েছে। কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রচার করলেও নারী কৃষকদের বরাদ্দ মাত্র ৩.৯২ শতাংশ। বছরে ২ কোটি কর্ম সংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছিলেন, আজ তা নির্মম পরিহাস মাত্র। ''বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও''-এর আড়ালে শিক্ষাক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে।

উদারীকরণের পথ বেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এসেছে নতুন নতুন লিঙ্গভিত্তিক শোষণ যা মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাকে বাড়িয়ে চলেছে। মহিলাদের অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হলো—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীন ভূমিকা। কিন্তু মহিলারা আজও এগুলির থেকে দূরে আছে। গরিব ও শ্রমজীবী পরিবারে গার্হস্থ্য হিংসা বাড়ছে। জাতিভিত্তিক বৈষম্য, পণপ্রথা, অনার কিলিং কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা আজও ঘটে চলেছে।

পাশাপাশি সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ বিল পাশের দাবি এখনো বিদ্যমান। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা, সামাজিক নিপীড়ন, লিঙ্গবৈষম্য, বেকারী, দারিদ্র, অপুষ্টির শিকারে আক্রান্ত মহিলাদের প্রতিবাদের ধ্বনি আজও বিদ্যমান। আজও মহিলাদের এই দিনে শপথ গ্রহণ করতে হয় তাদের অধিকার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য।

এখন আবার দেশে রাজ্যে সর্বত্র আক্রমণে নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ এখন আর কেবল হামলা, মিথ্যা অভিযোগে দায়ের করা মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। হামলা, মামলা, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু সামাজিক রসায়নকে ব্যবহার করে নানা বিভাজন ও ধর্মীয় মেরুকরণের যে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তার মোকাবিলা করা অনেক কঠিন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত। এক্ষেত্রেও প্রথম শিকার হন মহিলারা। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুজরাটের দাঙ্গায় একজন গর্ভবতী মহিলাকে ত্রিশূলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে গৈরীক বাহিনীর উল্লাসের চিত্র। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও দেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তির ফ্যাসিস্তসুলভ আক্রমণ এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। শিক্ষায় গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে। শুধু সংখ্যালঘু হত্যাই নয়, দলিত মানুষের উপর উচ্চবর্ণ মানুষের নতুন ধারার নগ্ন আক্রমণ এক ভয়ঙ্কর উগ্র চেহারা নিচ্ছে। গৈরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে প্রতিবাদী সাংবাদিক গৌরীলঙ্কেশসহ বহু নরনারীকে। এই রাজ্যও বাদ নয়। রাজ্য সরকার সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। দেশে খোলা রাস্তায় অস্ত্র হাতে রামনবমী পালিত হলে রাজ্যে ঘটা করে পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে হয়। বীরভূম জেলার বোলপুরের সান্তোরের নাম কারোর অজানা নয়। সংখ্যালঘু পরিবারের হায়তুন্নেসা বিবি কিভাবে তৃণমূলের নিকৃষ্টতম আক্রমণের শিকার হয়েছিল তা কারোরই অজানা নয়। ধনতন্ত্রের প্রচারের সাথে সাথে মনুবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার। একদিকে অত্যাধুনিক বেশভূষা, আই ফোন, স্মার্ট ফোনের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে দেবদেবীর পূজার্চনা, ভজন, কীর্তন, ব্রত উপবাসের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হিসাবে এই ধারণা সুকৌশলে আরএসএস, বিজেপি ছড়িয়ে দিতে তৎপর। বিশ্ব পুঁজিবাদী সঙ্কটের ফলে শ্রমজীবী মানুষের উপর বিশেষত মহিলাদের উপর তীব্র শ্রেণীশোষণ নেমে আসছে। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলি বিভিন্ন কায়দায় শ্রমজীবীদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চাইছে। তাদের লক্ষ্য শ্রমজীবী জনতার ঐক্য ভাঙা। আমাদের দেশে ধর্মীয় মেরুকরণ হচ্ছে ঠিক এই কারণেই। রাজ্যেও ঠিক একইভাবে শ্রেণীঐক্যের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার কৌশলে। রাজ্যের সরকার একদিকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বৈধতা দিচ্ছে, অপরদিকে মুসলিম মৌলবাদকে তোষণ করছে। আমাদের লড়াই করতে হবে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিরুদ্ধে।

শোষণমুক্তির স্বপ্নভরা চিন্তা চেতনার মধ্যেও আজকের দিনে মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন সামাজিক নিরাপত্তার দিক থেকে, দেশ ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই। রাজ্যে 'কন্যাশ্রী'-র উগ্র প্রচারে ঢেকে যাচ্ছে রাজ্যের নারী নির্যাতনের প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি, যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। ধর্ষণে, নারী ও শিশুপাচারে পশ্চিমবঙ্গ আজ প্রথম সারিতে। শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আর রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আশ্চর্যজনকভাবে ধর্ষণের হার বেঁধে দিয়েছেন ২০ হাজার, ৩০ হাজার টাকায়। এর ফলে মহিলারা যেমন অসম্মানিত হচ্ছেন, তেমনি অপরাধীরাও দ্বিগুণ উৎসাহ পাচ্ছে। নারীদের প্রতি সহানুভূতির কথা মুখে বললেও তাদের সুরক্ষার জন্য গৃহীত আইন কার্যকর হয়নি। কেন্দ্রে ৫০০ কোটি টাকায় 'নির্ভয়া তহবিল' গঠন করা হয়েছে—তা সত্ত্বেও নারীদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেও গড়ে তুলতে হবে তীব্র আন্দোলনের ঝড়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের থেকে যে অনেক উন্নত সমাজব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই যে নারীদের যোগ্য সম্মান-মর্যাদা দিতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। নভেম্বর বিপ্লবের পর মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই সমাজের বৈষম্যের সমস্ত প্রচলিত আইন বাতিল করে জমিদারী প্রথার অবসান এবং কৃষকদের জমি হস্তান্তর এবং সেখানে জমির উপর কৃষক রমনীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নরীর সমানাধিকারের এটাই ছিল প্রথম স্বীকৃতি। চালু হয় আট ঘণ্টার কাজের নিয়ম। নিষিদ্ধ হয় নারীদের রাতে কাজ করানোর প্রথা। এ ছাড়াও 'সামাজিক নিরাপত্তার বিধান'-এর মাধ্যমে কর্মরত সমস্ত নারীকে ন্যূনপক্ষে ১৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি মাসিক ঋতুকালে নারীদের ঐচ্ছিক ছুটির অধিকারও দেওয়া হয়। কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মজুরী চালু হয়, কোন বৈষম্য থাকে না। নারীপুরুষ নির্বিশেষে ভোটদানের অধিকার আন্দোলনের জন্ম যে দেশে, সেই বৃটেনের নারীরা ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল ১৯২০ সালে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া তার এক বছর আগে ১৯১৯ সালে নারীদের ভোটদানের অধিকার আইন হিসাবে চালু করে। এ সবই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সারা বিশ্ব জুড়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর সেখানকার মানুষ বুঝতে পেরেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুফল।

আমাদের লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যেতে ও আমাদের স্বপ্নকে সফল করতে গেলে সমাজের সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সমগ্র নারীজাতিকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং স্বপ্ন সফল করতে এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে সংগঠিত ভাবে বিভিন্ন লড়াই-সংগ্রাম আন্দোলনের ময়দানে ঝড় তুলতে হবে। তবেই প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন সার্থক হয়ে উঠবে। □

সমিতির রাজ্য সম্মেলন সমিতির রাজ্য সম্মেলন সমিতির রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতি

বিগত ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ কমরেড নরিপ্রসাদ শর্মা নগর (বর্ধমান) কমরেড মঞ্জু দে মঞ্চ, সুবর্ণ জয়ন্তী প্রেক্ষাগৃহে (কর্মচারী ভবন) ৪৬তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্ধমান শহরে প্রতিনিধিরা বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে সম্মেলন স্থলে প্রবেশ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করার পর উদ্বোধক, বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রুপ-ডি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা খোকন পাল, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহ বিশিষ্ট জনেরা ও সমিতির জেলাগুলি এবং সম্মেলনে উপস্থিত ভ্রাতৃপ্রতিম সমিতির পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন। তারপর প্রতিনিধিরা সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হন। বর্ধমান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির, গণসঙ্গীত টিমের পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

চুনীলাল মুখার্জী, বিশ্বেশ্বর রায়, সজল সরকার ও সমর ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় ও নীরবতা পালন করা হয়।

শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যক্ষ চন্দ্রপুরা কলেজ তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিশ্বপুঁজিবাদীরা দুনিয়া জুড়ে পুঁজির রমরমা কারবার করতে গিয়ে কিছু কিছু দেশে বাধা পাচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে। আমাদের দেশের সরকার এখন নব্য উদারনীতি দ্রুত লাগু করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট মাথা নত করে তার বড় বন্ধু হতে চাইছে। যে কথা বলে দেশে ক্ষমতায় এসেছিল সেগুলি যে ভাঁওতা ছিল, সেটা দেশবাসী বুঝতে পারছে, দেশে মৌলবাদীরা এই সময় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের মানুষকে ধর্মের নামে জাতপাতের নামে ভাগাভাগি করতে চাইছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার হরণ করে নিতে চাইছে। দেশ জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ধর্মঘট করছে। রাজ্যের সরকারও যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তা রাখতে না পেরে গণতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বত্র দলতন্ত্র কায়েম করছে। কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা করছে। আর কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন প্রদান না করে সংগঠন ভাঙ্গার জন্য প্রতিহিংসা মূলকবদলী করছে। রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। আমরাও আমাদের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মহার্ঘ ভাতা-ষষ্ঠ পে কমিশন প্রকাশ সহ হয়রানিমূলক বদলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার জন্য ধর্মঘটের প্রস্তুতি গ্রহণ করার আবেদন করে বলেন না হলে এই দুই সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। প্রশাসনের সমস্ত গ্রুপ-ডি কর্মচারীকে এমনকি অনিয়মিত কর্মচারীদের সংগঠনের আওতায় এনে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আগামীদিনে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্ববৃহৎ সমিতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য আবেদন করে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে উদ্বোধক বক্তব্য সমাপ্ত করেন। ৪৬টি বাতি জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এছাড়াও উদ্বোধনী সমাবেশে বর্ধমান জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী সমিতির সদস্য-সদস্যাদের পুত্র, কন্যাদের মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রতিবেদন পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রবীর নস্কর আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ১৯টি জেলা ও কলকাতার ৭টি জেলার পক্ষ থেকে প্রতিবেদন আয়-ব্যয়ের উপর ৩৬ জন সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে প্রগতিশীল বই বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলা ১২ই জুলাই কমিটি ও কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব প্রণব আইচ। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ২৮ হাজার টাকার বই ক্রয় করা হয়।

সমিতির ৪৬তম সম্মেলন মঞ্চ থেকে সমিতি বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন উদ্বোধক বিজয় শংকর সিংহ। সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ অতিথি খোকন দাস ত্রিপুরা সরকারী গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, তার বক্তব্যে ত্রিপুরায় বর্তমানে বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি পার্টি মৌলবাদী তাসকে সামনে এনে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে রাজ্যের কর্মচারী সমাজ সহ সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করেছে। হাজিরা সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠন সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস ও প্রতিনিধি পরিচিতি পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী।

দাবিগত প্রস্তাবসহ ৯টি বিষয় নিয়ে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জয়দেব হাজরা। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অলোক ভট্টাচার্য। এফ আর ডি আই বিল-এর বাতিলের দাবিতে পৃথক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের প্রবীণ নেতৃত্ব জয়দেব বক্সী। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সাহা।

বিশ্বেশ্বর রায়কে সভাপতি, প্রশান্ত সাহাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জয়দেব হাজরা ও অলোক ভট্টাচার্যকে যুগ্ম সম্পাদক, মন্টু দাসকে সংগঠন সম্পাদক, গোরাচাঁদ সরদারকে দপ্তর সম্পাদক, প্রবীর নস্করকে কোষাধ্যক্ষসহ মোট ১১ জনের কর্মকর্তা, ১৮ জনের সম্পাদকমণ্ডলীর গঠন করা হয়। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন

আগামীর কঠিন আন্দোলনে জনগণের সমর্থন ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের ২৫তম রাজ্য সম্মেলন। বিগত ২৩-২৪ ডিসেম্বর ২০১৭, কমরেড ধনঞ্জয় গড়াই মঞ্চ ও কমরেড গোপাল ভট্টাচার্য নগর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত হলো দুই দিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিমল দে। এরপর রক্তপতাকা সুসজ্জিত একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং মিছিলটি সম্মেলন স্থলে ফিরে এলে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্লোগান দিতে দিতে প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হন।

গণনাট্য সঙ্ঘের লোকশিল্পী শাখা গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। অলোক দাশগুপ্ত, মনিশঙ্কর গিরি ও প্রশান্ত ঝাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভাপতি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ও সভায় নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রকাশ্য অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য। তিনি ২৫টি লালবাতি জ্বেলে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধক তাঁর বক্তব্যে বলেন, এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যখন নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ ও কার্ল মার্কসের জন্মের ২০০ বছর পূর্তি প্রতিপালিত হচ্ছে। এমন একটা সময় মার্কসের লেখা ক্যাপিটাল গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে, কারণ পুঁজিবাদ তার কঠিন সমস্যা থেকে বের হবার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সম্মেলনের মূল পর্বে প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা দাস। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন বিশ্বজিৎ দত্ত। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন যথাক্রমে অনুপ কুমার দে, শক্তিপদ জানা ও গৌতম বণিক। দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সংগঠিত হয় প্রতিবেদনের উপর। এই আলোচনায় ৩৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় পুরুলিয়ার ঝালদা ব্লকের এক অস্থায়ী (MPW) কর্মী তাদের সার্বিক দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। উদ্বোধকসহ কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃত্বকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এই সম্মেলন মঞ্চে। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক রতন সাহা বক্তব্য রাখেন। জবাবী ভাষণে সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন ও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভীষণ প্রতিকূলতা রয়েছে, তাকে কাটিয়ে উঠে তারা গত দুটি বছর অনেকটা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে সাজিয়ে তুলতে পেরেছেন সে কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আশাবাদী যে এবার তাদের সদস্য সংখ্যা তারা গতবারের ৯৩৫কে ছাপিয়ে যাবে। তিনি বলেন এই সরকারের আমলে আমাদের উচ্চতর আধিকারিকদেরই কোন সম্মান নেই, ফলে নিচু স্তরের কর্মচারীরা প্রশাসনে সম্মান পাবেন এই ভাবনা অলীক এই উন্নাসিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমরা বিরোধী পক্ষ, আমরা যা চাইবো সরকার তা দেবে না—তাই লড়াই জারি রাখতে হবে। আগামী দিনে ধর্মঘটের পথে আমাদের এগোতে হবে।

প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর ৬২ জনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীতে সভাপতি প্রশান্ত ঝা, সহ-সভাপতিদ্বয় গৌতম ঘোষ এবং মানস বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা দাস, কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দত্ত, দপ্তর সম্পাদক অরুণ কুমার দে এবং পত্রিকা সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। সভাপতি সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। □

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

সমিতির ৬৭-৬৮ তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ২৪-২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ বর্ধমান জেলা কর্মচারী ভবনে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনকে সফল করা লক্ষ্যে অধ্যাপক ডঃ সুকৃতি ঘোষালকে সভাপতি করে একটা শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন সভাপতি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতিত্রয় যথাক্রমে তাপস সেন, দেবব্রত দাশগুপ্ত এবং তরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধরী। তিনি বর্তমান বাস্তবতায় লড়াই আন্দোলনে সমিতির কর্মী নেতৃত্বদের সেনাপতির ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান এবং আসন্ন ধর্মঘটের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ, প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন সংগঠন সম্পাদক অজয় মুখার্জী, অশোক রায় এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় মুখার্জী। আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অমলেশ ধর। উত্থাপিত সনদের উপর জেলা অঞ্চল বিভাগীয় সংগঠন কমিটির পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মেলনের অন্তর্বস্তুকে সমৃদ্ধ করেন।

আলোচনার সূত্রায়ন করে জবাবী বক্তব্য রাখেন আয়-ব্যায়ের হিসাবের উপর কোষাধ্যক্ষ অমলেশ ধর এবং প্রস্তাবাবলীর উপর অন্যতম যুগ্মসম্পাদক তন্ময় মুখার্জী। সমগ্র আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল।

সম্মেলন উপলক্ষে একটি বুক স্টল করা হয় আবাসন স্থলে, সেই বুকস্টলের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা সমিতির নেতা অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০ হাজার টাকার বেশি বই সেখানে বিক্রি হয়।

সম্মেলন থেকে ১৪ জন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলন সংযোগ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলন থেকে অসিত রায়কে সভাপতি, সুমনকান্তি নাগকে সাধারণ সম্পাদক, অজয় মুখার্জী, অজয় সমাদ্দার, অশোক রায় যুগ্মসম্পাদকত্রয়, মণিশঙ্কর মণ্ডল এবং সুমন ব্যানার্জীকে সংগঠন সম্পাদকদ্বয়, ইন্দ্রনীল দত্তকে দপ্তর সম্পাদক এবং অসীম মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সমিতির মুখপত্র সংযোগের সভাপতি সনৎ বেরা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলনে মোট ২৯১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক জয়দীপ নিয়োগীর অকাল প্রয়াণে তার স্মারক একটি গেট সম্মেলনস্থলের ঢোকার মুখে রাখা হয়। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন

সমিতির ৪৩-৪৪ তম রাজ্য সম্মেলন ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে A. V. School এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগের দিন ২৯ ডিসেম্বর প্রগতিশীল বুক স্টল উদ্বোধন করেন প্রণব চট্টোপাধ্যায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর প্রাক্তন সম্পাদক। সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে ৪৪টি রক্ত পতাকা নিয়ে এক বর্ণাঢ্য মিছিল কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে শহিদ বেদীর সামনে উপস্থিত হয়। এরপর সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সভাপতি মলিনা হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচীর পর প্রতিনিধিরা এক এক করে সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সম্মেলনের মূল কাজ শুরু হয়। সম্মেলন পরিচালনা করবার জন্য তিনজনকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা ছিলেন মলিনা হালদার, কৃষ্ণা বোস ও সরস্বতী ভট্টাচার্য। সম্মেলন উদ্বোধন করে রক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, তিনি সমিতির মুখপত্র সেবাব্রতীর সম্মেলন সংখ্যা উদ্বোধন করেন। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উত্থাপন করেন নিবেদিতা দাশগুপ্ত, অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা, আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কুমকুম মিত্র। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদিকা তপতি দত্ত বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন মঞ্চে ব্যক্তিদের সংবর্ধনা ও সমিতির প্রবীণ সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ২৬৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৯জন বক্তব্য রাখেন। জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদিকা গীতা দে। সম্মেলন থেকে ১২০ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ২ দিন ব্যাপী এই সম্মেলন থেকে আগামী দুই বৎসরের জন্য নব নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—

সভাপতি : স্বস্তিকা সরকার, সাধারণ সম্পাদিকা গীতা দে, কোষাধ্যক্ষ কনিকা দত্ত, দপ্তর সম্পাদিকা : সেরপা খাতুন। মুখপত্র সম্পাদিকা : কুমকুম মিত্র ও সহযোগী মুখপত্র সম্পাদিকা কাজল গিরি। প্রগতিশীল বুক স্টল হইতে পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে মোট ২২৫৯৫/-। □

ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানাভাবে সমস্ত সম্মেলনের প্রতিবেদন একই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। এই কারণে আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যায় অন্যান্য সমিতির সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

পরীক্ষার্থীদের পাশে সংগঠন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, জলপাইগুড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে সংগঠনের সদস্যদের যে সকল সন্তান-সন্ততী এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের সকলকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার (এ.বি.টি.এ) বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে দুটি ইংরাজী মাধ্যমে পাঠরত পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী Question Bank প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়ে সন্তান-সন্ততীর হাতে পুস্তক তুলে দিয়েছেন এবং আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। এই কর্মসূচী সদস্য ও পরিবারের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

সদস্য পরিবারে মাধ্যমিকে ২৯ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৩ জন পরীক্ষার্থী এবছর পরীক্ষায় বসবে। □

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ

গত ইংরাজী ৩০/১১/১৭ তারিখে বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে বর্ধমান জেলা শাখার সহযোগিতায় মহিলা উপসমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সভা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সভানেত্রী রীনা কোনার। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন মহিলা উপসমিতির নেত্রী ছায়া মণ্ডল। উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন দুজন নেত্রী—সুস্মিতা বুট, মধুমিতা চ্যাটার্জী। জেলা সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী উপস্থিত সদস্য ও সদস্যাদের অভিনন্দন জানান ও সভানেত্রী সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরাম পত্রিকার গ্রাহকভুক্তির কাজ যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে।—কে.ক

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
46th Year, 10th Issue, February'18

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে সিরিয়ার সংগ্রাম

গত ২০১১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে, শুরু হয়েছে সিরিয়া সঙ্কট। আমরা জানি তেলসমৃদ্ধ আরব দুনিয়ার ওপর সম্পূর্ণ দখলদারির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধাভিযান শুরু প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকেই। এরপর ইরাকে রাসায়নিক অস্ত্র আছে—মিথ্যা অজুহাতে ইরাক দখল, সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসি। পরে আইসিস, আল-নুজরাসহ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে মদত দিতে থাকে। সিরিয়াকে দখল করে আক্রমণ হানার উদ্দেশ্য ইরানের উপর। সিরিয়া ও ইরান শুধু তেল সমৃদ্ধ বলে নয়— সিরিয়া-ইরান-রাশিয়ার মাটি না ছুঁয়ে গোটা আরব দুনিয়া থেকে তেল ইউরোপের দেশগুলিতে ঢোকা সম্ভব নয়। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য নির্ভর করছে সিরিয়া এবং ইরানের মাটির দখল কার হাতে থাকবে তার ওপর। সিরিয়া মাটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোণঠাসা অবস্থায়। এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আসাদ, ইরান এবং রাশিয়াকে একঘরে করার পরিকল্পনা করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। সিরিয়া যুদ্ধে সেখানকার ৪,৬৫,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, এর মধ্যে প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি শিশু। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি দেশে এবং দেশের বাইরে উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীর নয়া সাম্রাজ্যবাদী যুগে মানবতা কথাটির অবশিষ্ট বলে থাকছে না।

সিরিয়ার বাসার আল আসাদ সরকার একটি বৈধ সরকার। দীর্ঘ আট বছর ধরে সিরিয়া আইসিসসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মূলত রাশিয়ার পূর্ণসহযোগিতায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মুক্ত করতে পেরেছে।

মনোজ রক্ষিত

দিওর এজের মতো তেল সমৃদ্ধ এলাকাতেও আইসিস পিছু হটেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঐ তেল ক্ষেত্র দখল করেছিল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতেই।

সিরিয়া থেকে প্রায় ৩০০-র বেশি ট্যাঙ্কার, ৪০,০০০ এর মতো সন্ত্রাসবাদী বাহিনীকে নিরাপদে পালানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল। বর্তমানে সিরিয়ার যে ক'টি অঞ্চল সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাবাধীন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম পূর্ব ভৌটা। সাম্প্রতিক সময়ের এই পূর্ব ভৌটা থেকে (১৫ ফেব্রুয়ারি'১৮—২৪ ফেব্রুয়ারি'১৮) সন্ত্রাসবাদীরা সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের দিকে মিসাইল, রকেট, মর্টার শেল... দিয়ে আক্রমণ করে। জারামানা অঞ্চলে সার্জারি হাসপাতালের ওপর বোমা বর্ষণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এই ক'দিনে শিশুসহ ১০৭জন মানুষ মারা গেছেন, আহত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

সন্ত্রাসবাদীদের কবলিত পূর্ব ভৌটায় সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জয়শ-আলি ইসলাম ছোট ছোট শিশুদেরও 'হিউম্যান শিশু' বানানোর চেষ্টা করছে।

সিরিয়ান সরকার বার বার রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং নিরাপত্তা পরিষদে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ট্রেনিং ক্যাম্পের ভিডিওসহ নানা তথ্য প্রমাণ জমা দেওয়া সত্ত্বেও কোনও ফলপ্রসূ হয়নি। আবার নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ান অ্যাম্বাসাডর বাসার আলি জাফরি মোট রকেট ও শেল-এর হিসাবসহ ধারাবাহিক অভিযোগ জানিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে। তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে হয়—২০০৭-১০ সালে তীব্র খরায় জর্জরিত হয়ে গ্রামীন এলাকা থেকে শহরে যাওয়ার ফলে ১.৫ মিলিয়ন মানুষের দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়। এই অস্থিরতাকে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা চালাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর মদতেই। কারণ মার্কিন মদতপুষ্ট শক্তি সিরিয়া দখল করতে চায়, অন্যদিকে সিরিয়া দখলদারি থেকে মুক্ত করতে চাইছে। এটা সিরিয়ার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। সিরিয়ায় বৈধ সরকার—অন্যদিকে মদতপুষ্ট আল-নুসরা থেকে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি দখলদারি চালাচ্ছে যা অবশ্যই অবৈধ। সিরিয়ার সম্পদ—সার্বভৌমত্ব, মানুষকে রক্ষা করার জন্য লড়ছে সিরিয়া। মার্কিন যৌথ বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আক্রান্ত ২৩ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করে চলেছে সিরিয়া এবং ইরানের সরকার।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয় এই কারণে সিরিয়া ও ইরানের ওপর মার্কিন দখলদারির ছক। লক্ষ্য তেল এবং গ্যাসের দখলের জন্য। □

আর এক লঙ মার্চ

মুম্বাইয়ের বুকে অন্নদাতার পদচিহ্ন

দেখুন দেখুন মুম্বাই, দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী, হিন্দী চলচ্চিত্রের কেন্দ্রস্থল লাল পতাকায় ডুবে যাচ্ছে। সবক'টা চ্যানেলে এই দৃশ্য সংবাদ লাইভ দেখাচ্ছে, বলা যেতে পারে দেখাতে বাধ্য হচ্ছে। একেই বলে আন্দোলন। ইস্ ওরা পারে, আমরা পারি না? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে সহকর্মী বন্ধু কৌতুহলভরা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন। প্রশ্নটা আমাদের মনেও উঁকিঝুঁকি মারছে সন্দেহ নেই। আমরা পারি না? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি ধর্মান্ধ ও জাত্যাভিমানি শক্তির দাপাদাপি, সেখানে এমন লাল ঝাণ্ডার ঢেউ। ওরা পেরেছে—আর পেরেছে বলেই তো গত ২০ বছর ধরে ধারাবাহিক আত্মহত্যার মর্মান্তিক আঘাতকে জয় করে একটু একটু করে চোয়াল শক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে সমস্ত ক্ষোভকে রাজপথে উগড়ে দিতে পেরেছে। বাংলার আহল্যা মা-র আখ্যান আর মুম্বাইয়ের ষাটোর্ধ্ব বয়সের দরিদ্র কৃষক রমনীর পায়ে ক্ষত চিহ্ন রক্ত লেখায় একাকার হয়ে গেছে। একাকার পাতাকা আর টুপির লাল রঙ। ১২ মার্চ ২০১৮ মুম্বাই লাল স্রোতে স্নাত হলো।

কৃষকের ন্যায্য দাবি—● কৃষিঋণ সম্পূর্ণ মুকুব করতে হবে ● ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে ● জমির অধিকার দিতে হবে ● কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের পেনশন দিতে হবে ● অরণ্যবাসীদের অরণ্যের অধিকার দিতে হবে সহ কৃষক জীবনের দৈনন্দিন অজস্র যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নাসিক থেকে থানে পালঘর হয়ে মুম্বাই প্রায় ১৮০ কিমি হাঁটলেন হাজার হাজার কৃষক সারা ভারত কৃষকসভার নেতৃত্বে। ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মানুষের সংগ্রামী মিছিল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি পথপার্শ্বস্থ গ্রাম শহরের অধিবাসীরা।

মুম্বাইয়ের পথে লাল ঝাণ্ডার স্রোত

তারাও তাদের সামর্থ উজার করে খাদ্য পানীয় তো যোগান দিয়েছেনই সাথে চিকিৎসাসহ যাত্রাপথে জুতো চটির বন্দোবস্ত করে মনোবল যোগান দিয়েছেন মুম্বাই শহরের বিখ্যাত ডাব্বাওয়ালাদের সংগঠন এগিয়ে দিয়েছে খাবার। যার সম্মিলিত তুফানে কেঁপে উঠেছে মুম্বাইয়ের রাজপথ হয়ে আজাদ ময়দান। মহারাষ্ট্র সরকার প্রথম দিকে এই মহামিছিলকে অবজ্ঞা করলেও সেই মিছিল যখন মুম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তদের বিপুল অভিবাদন পেয়ে হেস্তনেস্ত করার আবেগে ফুটছে, শাসকরা সেই উত্তাপ অস্বীকার করতে পারেনি, ফলে ৩ জন মন্ত্রীকে পাঠিয়ে কৃষকদের সবগুলি দাবি মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। না আমাদের রাজ্যের মতো লাঠিসোটা নিয়ে, জলকামান নিয়ে, স্টীল ব্যারিকেড দিয়ে সেই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেননি, মিছিলের উত্তাপ বিধানসভাকে বাধ্য করেছে দাবি মানতে।

সমগ্র কৃষক লঙ মার্চের আগে অবশ্য গোটা দেশ জুড়ে ৪টি বৃহৎ জাঠা ২২টি রাজ্যের ১৮০০০ কিমি. পথ অতিক্রম করেছিল তারপর এই লঙ মার্চের আহ্বান। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী পি সাইনাথের মতে রাস্তায় মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তরা কৃষকদের খাবারসহ বিভিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন মুম্বাইয়ের মানুষ এমন দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। বিবিসি, জাপান টাইমস, লেলিসুর, ডেইলি মেল, ডে চে ওয়েল, ওয়াশিংটন পোষ্ট, দ্য ইন্ডিপিন্ডেন্ট, জাকার্তা পোষ্ট, দ্য গার্ডিয়ান ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রেও এই কৃষক লঙ মার্চের খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের কাগজগুলোও প্রথম দিকে ব্ল্যাক আউটের চেষ্টা করলেও পরের দিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য উত্তর সম্পাদকীয় জ্ঞান বিতরণের সাথে বিভ্রান্তি ছড়াবার কসুর নেই।

এন ডি টিভি, ইন্ডিয়া টুডে, টাইমস নাউ, সি এনএন নিউজ ১৮, জি নিউজ সহ সবক'টা চ্যানেলে এই সংবাদ গোটা দেশে আলোড়ন ফেলেছে। মেহনতীদের প্রত্যয় জেগেছে জয় সম্ভব। □ **অশোক রায়**

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হরিয়ানার ফরিদাবাদে, হোটেল ম্যাগপিক-এর হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। হরিয়ানা রাজ্যের সংগঠন সর্ব কর্মচারী সংঘ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে ছিল।

সভার শুরুর প্রাক্কালে পদাধিকারীদের নিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা শুরু হয় বেলা ১১.৩০টায়। সভার প্রারম্ভে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার সর্বভারতীয় সংগঠনের অগ্রগন্য নেতা ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পেশ করেন এবং সভায় সদস্যরা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর আর একটি শোক প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং সভায় শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এরপর হরিয়ানা রাজ্যের নেতা ধরমবীর ভগৎ উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে সাধারণ সম্পাদক প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন। আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি গত ৯-১১ নভেম্বর ২০১৮ পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচী ও তার সাফল্য উল্লেখ করেন এবং আগামীতে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সর্বতো উদ্যোগ নিতে বলেন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির ভয়াবহ দিক উল্লেখ করেন এবং শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় ও অটুট রাখতে প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উদ্যোগী হতে বলেন। তিনি বলেন, দেশের সংসদে ও বাইরে একমাত্র বামপন্থীরাই গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছেন।

তিনি বলেন বিগত কর্মসূচী আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান যে সব রাজ্যে হয়নি আগামী ২৭শে মার্চ, ২০১৮ অনুষ্ঠিত করতে হবে। এছাড়া ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন ৫-৮ এপ্রিল ২০১৮ চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত হবে এবং সম্মেলন কেন্দ্রিক কিছু জরুরী বিষয় উল্লেখ করেন। এছাড়াও আশু সাংগঠনিক কর্মসূচীর জরুরী বিষয়গুলি প্রস্তাবাকারে রাখা হয়। এছাড়া সর্বভারতীয় সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধনীর জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হিমাংশু সরকার সংশোধনী নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবের ওপর ২ জন মহিলাসহ ১৯ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং হেড কোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের ফান্ডে ২ লক্ষ টাকার চেক সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেন। সভায় সদস্যদের পরিস্থিতি ও সংগঠন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার।

সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

(১) আগামী ২৭ মার্চ, ২০১৮ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচী পালন করতে হবে (যে সব রাজ্য এখনও করেনি)।

(২) ৫-৮ এপ্রিল, ২০১৮ ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন চেন্নাই-এ অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বলা হয়।

(৩) ৫ মার্চ, ২০১৮-এর মধ্যে রাজ্যগুলির ওয়ার্কস রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

(৪) প্রতিবেদনের উপর বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকলে ১০ মার্চ, ২০১৮ মধ্যে পাঠাতে হবে।

(৫) হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং ফান্ডে টাকা যে সব রাজ্য এখনও দেয়নি বা বকেয়া আছে তা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

(৬) ৮ মার্চ, ২০১৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজ্যে রাজ্যে কর্মসূচী করতে হবে।

(৭) এছাড়া পত্রিকা (এমপ্লয়িজ ফোরাম) গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বকেয়া জমাসহ, সাংগঠনিক অন্যান্য বকেয়া দ্রুততার সাথে জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। আসন্ন ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সবরকম প্রাক প্রস্তুতি কাজকর্ম সঠিক সময়ে প্রতিপালন করার অনুরোধ করা হয়। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।